দ্বিতীয় সংস্করণ—পৌষ, ১৩৫০

প্রকাশক :

শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়

বাক্-সাহিত্য

৩৩, কলেজ রো,

কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :

শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায়

অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৭/এ বলাই সিংহ লেন

কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট—শ্রীকানাই পাল

মাতৃদেবীর শ্রীচরণে

ভূমিকা

দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন নেই। কিশোর রবির জীবনালেখ্য বাংলার কিশোরদের হাতেই তুলে দিলাম। কিশোর রবির সাথে ভালো করে পরিচয় হোক বাংলার কিশোরদের।

উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' ও 'রবীন্দ্রজীবন কথা' থেকে। ঋণ-স্বীকার করবার প্রয়াস পেয়ে শুধু ঋণের বোঝা'ই বাড়ানো হবে—সে চেষ্টা করব না। তা'ছাড়াও অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে—যথাস্থানে তার স্বীকৃতি আছে।

সুষ্ঠু প্রকাশনার কৃতিত্ব 'বাক্-সাহিত্য' সংস্থার শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়ের। তাঁদের অবারিত সহায়তার ফলেই বইটির অতিদ্রুত প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গ্রন্থকার

জগৎ পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে মেলা।
অন্তহীন গগনতল
মাথার 'পরে অচঞ্চল,
ফেনিল ওই সুনীল জল
নাচিছে সারা বেলা।
উঠিছে তটে কী কোলাহল—
ছেলেরা করে মেলা।

বালুকা দিয়ে বাঁধিছে ঘর,
ঝিনুক দিয়ে খেলা।
বিপুল নীল সলিল-'পরি
ভাসায় তারা খেলার তরী
আপন হাতে হেলায় গড়ি
পাতায়-গাঁথা ভেলা।
জগৎ-পারাবারের তীরে
ছেলেরা করে খেলা।

—শিশু

এক

রবীন্দ্রনাথ 'যোগাযোগ' উপন্যাসের গোড়াতেই বলেছেন,

'গল্পটার এইখানেই আরম্ভ। কিন্তু আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যাবেলায় দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো।'

আমরাও রবীন্দ্রনাথের শৈশব ও কৈশোরের কাহিনী আরম্ভ করার আগে একবার পিছন ফিরে' জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর গোড়াকার ইতিহাসটা উল্লেখ করে নিই।

রবীন্দ্রনাথ যে-বংশে জন্মগ্রহণ করেন তাঁদের পূর্বেকার নিবাস ছিল যশোহরে—সেখানে সে-সময়ে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ছিল কম, কারণ তাঁরা ছিলেন সমাজে পতিত 'পিরালী' ব্রাহ্মণ। এই বংশের পঞ্চানন কুশারী তাঁর যশোহরের নিজগ্রাম 'বারোপাড়ার' পৈতৃক বাড়ী পরিত্যাগ করে বর্তমান কলকাতার গড়ের মাঠের দক্ষিণে আদি-গঙ্গার তীরে এসে বাস করতে থাকেন। ঐ অঞ্চলে তিনিই ছিলেন তখন একমাত্র ব্রাহ্মণ। স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত এবং 'ঠাকুর মশাই' বলে তাঁকে অভিহিত করত। পঞ্চানন কুশারীর কাজ ছিল জাহাজে মালপত্র সরবরাহ করা। ক্রমে ক্রমে পঞ্চানন কুশারী পঞ্চানন ঠাকুর নামে পরিচিত হন, অর্থাৎ 'কুশারী' উপাধি 'ঠাকুরে' পরিণত হয়ে যায়। ইংরেজদের কাছে 'ঠাকুর' উপাধিটা Tagoure বা Tagore নামে রূপান্তরিত হয়। রবীন্দ্রনাথদের বংশের 'ঠাকুর' উপাধি পাওয়ার ইতিহাসটা সংক্ষেপে এই। এই পঞ্চানন ঠাকুরের দুই পৌত্র নীলমণি ও

দর্পনারায়ণ হতে জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার দুই ঠাকুর বংশের সূত্রপাত।

নীলমণি ঠাকুর উড়িষ্যায় কালেক্টরের সেরেস্তাদার ছিলেন, এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। দর্পনারায়ণেরও বিষয়বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ছিল—তিনিও ব্যবসায়ে প্রচুর অথ উপার্জন করেন। দুই ভাই একত্রে পাথুরিয়াঘাটায় একটি সুন্দর বাড়ী তৈয়ার করেন, কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে পরে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় নীলমণি একলক্ষ টাকার পরিবর্তে পাথুরিয়াঘাটার বাড়ী এবং নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি ভাই দর্পনারায়ণকে দিয়ে নিজে এসে জোড়াসাঁকোর গৃহ নির্মাণ করেন। তিনি জোড়াবাগানের বৈষ্ণব চরণ শেঠের নিকট থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীর এক বিঘা সম্পত্তি দেবোত্তর হিসাবে পান। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাস থেকে জোড়া-সাঁকোয় ঠাকুরগোষ্ঠীর বাসের সূত্রপাত হয়।

নীলমণির জ্যেষ্ঠ পুত্র রামলোচন পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির দেখাশুনা করতে থাকেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন বলে ছোট ভাই রামমণির পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে রামলোচনের মৃত্যু হয়—তখন দ্বারকানাথের বয়স বারো কি তেরো। দ্বারকানাথ অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন—সুপ্রীম কোর্টের ব্যারিস্টার ফার্গুসনের সাহায্যে তিনি আইন বিশেষজ্ঞ হন ও অনেক বড় জমিদারের আইন পরামর্শদাতার পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি চব্বিশ পরগণার কালেক্টরের দেওয়ানের পদ পান। কয়েক বৎসর কাজ করার পর তিনি কোম্পানীর চাকুরী ত্যাগ করেন, এবং 'কার-ঠাকুর কোম্পানী' প্রতিষ্ঠা করে' ব্যবসায় করতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন করেন এবং নানা জায়গায় সম্পত্তি কিনে জমিদারী বাড়াতে থাকেন। নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের সম্পত্তি

দেনার দায়ে যখন বিক্রয় হয়, সে-সম্পত্তির অনেকাংশ দ্বারকানাথ ক্রয় করেন। এ-ভাবেই উত্তর বঙ্গের জমিদারীর পত্তন হয়। তা'ছাড়া তিনি রাণীগঞ্জের কয়লার খনির ইজারা নেন, এবং রামনগরে চিনির কল প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বারকানাথ যেমন প্রচুর উপার্জন করতেন তেমনি ব্যয়ও করতেন খুব। তাঁর পার্টিতে নেমন্তন্ন পাবার জন্য তখনকার দিনের কোম্পানীর সাহেব এবং দেশীয় ধনী ও পদস্থ ব্যক্তিগণ উন্মুখ হয়ে থাকতেন। তিনি দু'বার বিলাত যান, এবং দ্বিতীয় বার বিলাত প্রবাস কালেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিলাতেও তিনি এত অর্থব্যয় করে জাঁকজমকে থাকতেন যে, ওখানে তাঁকে প্রিন্স (রাজা) আখ্যা দেওয়া হয়।

নীলমণি যে-বাড়ী তৈয়ার করেন সে-বাড়ীর পাশেই দ্বারকানাথ আর একটি বাড়ী প্রস্তুত করেন। ওটা 'বৈঠকখানা বাড়ী' নামে খ্যাত ছিল। তখন ঠাকুর পরিবার ছিল খুবই রক্ষণশীল—গৃহে 'লক্ষ্মীজনার্দন' প্রতিষ্ঠিত ছিল। মূল বাড়ীতে সাহেবদের খানাপিনা দেবার অসুবিধা হওয়াতেই 'বৈঠকখানা বাড়ী' নির্মিত হয়। মূল বাড়ী ছয় নম্বর এবং 'বৈঠকখানা বাড়ী' পাঁচ নম্বর দ্বারকানাথ লেইনে। প্রথম বার বিলাত থেকে ফিরে আসার পর মূল বাড়ীতে থাকার অসুবিধা হওয়ায় দ্বারকানাথ পাঁচ নম্বর বাড়ীতেই বাস করতে থাকেন। পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলে দ্বারকানাথের মধ্যমপুত্র গিরীন্দ্রনাথের বিধবা স্ত্রী তাঁর পুত্র কন্যা সহ ঐ বাড়ীতে উঠে যান। গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র হচ্ছেন গগনেন্দ্র, অবনীন্দ্র।

দুই

দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ। দ্বারকানাথের সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী ঐশ্বর্যে ও মর্যাদায় কলকাতার শীর্ষস্থান অধিকার করে। ঠাকুর বাড়ীর লোকদের কথায়-বার্তায় একটা বিশেষ ভঙ্গী এবং চাল-চলনে একটা বিশিষ্ট আভিজাত্যের ছাপ দেখা যায়—এমন কি, অন্যের অনুকরণস্থল হয়ে উঠে। দেবেন্দ্রনাথ ঐশ্বর্যে লালিত পালিত হলেও মন একটু স্বতন্ত্র ভাবে গড়ে উঠে। পিতামহী অলকা দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি একটি ছিন্নপত্রে উপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকটি পান :

ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্
যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ
মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

[এই পৃথিবীর সকল কিছুই ঈশ্বরে নিহিত—কোনও কিছুর পরে লোভ না করে ত্যাগের মাধ্যমে ভোগ করবে]

শ্লোকটির অর্থ সম্পূর্ণ বুঝতে না পেরে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে যান। মর্মার্থ অবগত হয়ে তিনি নিজকে ঐ আদর্শে চালিত করবার জন্য কৃতসংকল্প হন এবং ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২১ শে ডিসেম্বর (৭ই পৌষ) দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ২৬ বৎসর। পিতার অমতেই তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের তিন বৎসর পরে পিতার ইংলণ্ডে মৃত্যু হয় (১ আগষ্ট, ১৮৪৬)। দ্বারকানাথ বহু টাকা ঋণ

করে যান, কিন্তু ছেলেদের যাতে সে ঋণের দায় গ্রহণ করতে না হয় সেই জন্যে বিষয়-সম্পত্তি ট্রাস্ট সম্পত্তি করে যান। দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র এমন বিশাল ও উদার এবং তাঁর নৈতিক মান এত উচ্চ ছিল যে, তিনি এ-ভাবে পিতৃঋণ অস্বীকার করে সম্পত্তি ভোগ করা অন্যায় বলে মনে করেন, এবং সমগ্র ঋণ-ভার গ্রহণ করেন। তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব ও উদারতার জন্য ব্রাহ্ম সমাজ তাঁকে 'মহর্ষি' এই আখ্যা দ্বারা ভূষিত করেন।

তিন

রবীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশ সন্তান। মাতা সারদা দেবী। সারদা দেবী শিক্ষিতা না হলেও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য খুব-ই ভালো ছিল, এবং তিনি সুগৃহিণী ছিলেন। বৃহৎ ঠাকুর পরিবারের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে মধ্যরাত্রির পর (২৫শে বৈশাখ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী)। দেবেন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যা জন্মের অল্প কিছু দিন পরেই মারা যায়। তার নামকরণই হতে পারে নি। অন্যান্য পুত্র কন্যাদের নামঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, সৌদামিনী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুকুমারী, পুণ্যেন্দ্রনাথ, শরৎকুমারী, স্বর্ণকুমারী, বর্ণকুমারী, সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বুধেন্দ্রনাথ।

ভ্রাতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। 'বড় দাদা' দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন কবি ও দার্শনিক—'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের রচয়িতা। 'মেজদাদা' সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ভারতীয় আই, সি, এস,—সুলেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি, উদারনৈতিক ও কুসংস্কার বিরোধী। 'সেজদাদা' হেমেন্দ্রনাথ কেশব সেনের অনুরাগী, বাংলা ভাষা শিক্ষার উগ্র সমর্থক —এই সেজদাদাই রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বালকদের শিক্ষার ভার প্রথম অবস্থায় গ্রহণ করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রকলায় অসামান্য প্রতিভাবিশিষ্ট এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ছিলেন।

চার

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁদের পরিবার কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। তখনকার কলকাতার এক সুন্দর বর্ণনা পাই রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে:

'আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে ছ্যাকড়া গাড়ী ছুটছে তখন ছড়্ছড়্ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর গাড়ী। তখন কাজের এত বেশী হাঁস ফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলতো। বন্ধুরা আপিসে যেতেন কষে তামাক টেনে নিয়ে পান চিবোতে চিবোতে, কেউ বা পাল্কি চড়ে কেউ বা ভাগের গাড়ীতে। যারা ছিলেন টাকাওয়ালা তাঁদের গাড়ী ছিল তকমা-আঁকা, চামড়ার আধ-ঘোমটাওয়ালা; কোচ্বাক্সে কোচ্মান বসত মাথায় পাগড়ি হেলিয়ে, দুই দুই সইস থাকত পিছনে, কোমরে চামর বাঁধা, হেঁইয়ো শব্দে চমক লাগিয়ে দিত পায়ে-চলতি মানুষকে।'

রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন জোড়াসাঁকের মূল বাড়ীতে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ঐ বাড়ীর পত্তন করেন নীলমণি ঠাকুর। ক্রমে ক্রমে যেমন পরিবারের জনসংখ্যা বাড়তে থাকে তেমনি বাড়ীর আকারও ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। অনেক ঘর, আঁকা বাঁকা সিঁড়ি, বিভিন্ন আঙ্গিনা—সব মিলে বাড়ীটা যেন একটা গোলক ধাঁধায় পরিণত হয়েছিল। শিশু রবীন্দ্রনাথের কাছে বাড়ীটা একটা রহস্যপুরীর মত মনে হত। মূল বাড়ীর দক্ষিণে ও পশ্চিমে দুইটি বারান্দা—পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় অদূরের রাস্তা। বাড়ীর দক্ষিণে ছিল একটি বাঁধাঘাটওয়ালা পুকুর, তার পূর্ব পারে প্রাচীরের গায়ে মস্ত

বড় এক বটগাছ, দক্ষিণ দিকে এক সারি নারিকেল গাছ। এই বটকেই উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ পরে লিখেছেন,

'নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছ
মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে
ওগো প্রাচীন বট। ('পুরোনো বট'—শিশু)

এই বৃদ্ধ বট সম্বন্ধে 'পুনর্মিলন' কবিতায় তিনি লিখছেন,

'পূর্ব ধারে বৃদ্ধ বট
মাথায় নিবিড় জট,
ফেলিয়া প্রকাণ্ড ছায়া দাঁড়ায়ে রহস্যময়।
আঁকড়ি শিকর-মুঠে
প্রাচীর ফেলেছে টুটে,
খোপেখাপে ঝোপেঝাপে কত-না বিস্ময় ভয়।
['পুনর্মিলন'—প্রভাত সংগীত]

বাড়ীর ভিতরে একটি বাগান ছিল। সে-বাগান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখেছেন,

'বাড়ীর ভিতরে আমাদের যে-বাগান ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশী বলা হয়। একটা বাতাবী লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও এক সার নারিকেল গাছ তাহার প্রধান সংগতি। মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। তাহার ফাটলের রেখায় রেখায় ঘাস ও নানা প্রকার গুল্ম অনধিকার প্রবেশপূর্বক জবর-দখলের পতাকা রোপণ করিয়াছিল। যে-ফুল-গাছগুলো অনাদরেও মরিতে চায় না তাহারাই মালীর নামে কোন অভিযোগ না আনিয়া, নিরভিমানে যথাশক্তি আপন কর্তব্য পালন করিয়া যাইত।'

পূর্বেই বলা হয়েছে মূল বাড়ীর পাশেই ছিল দ্বারকানাথের বৈঠকখানা বাড়ী। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর ঐ বাড়ীতে বাস করতেন গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী পুত্র কন্যা সহ। ঐ বাড়ীর দক্ষিণেও এক প্রশস্ত বারান্দা। ঐ দক্ষিণের বারান্দা প্রসিদ্ধি লাভ করে গিরীন্দ্রনাথের পৌত্র অবনীন্দ্রনাথের সময়। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দশ বৎসরের ছোট। অবনীন্দ্রনাথ বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী ও শিশু-সাহিত্যিক—শিশুদের প্রিয় 'অবন পটুয়া'। ঐ দক্ষিণের বারান্দায় ছিল তাঁর চিত্রাঙ্কণ-গৃহ এবং কাটুম-কুটুমের সংগ্রহ শালা। অবনীন্দ্রনাথ নুড়ি পাথর ও শুকনো গাছের ভাঙ্গা ডাল সংগ্রহ করে রেখে দিতেন, এবং ডাল পালার উপর রংয়ের পোঁচ দিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস সৃষ্টি করতেন [দ্রষ্টব্য : 'দক্ষিণের বারান্দা' মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়]। এই পাঁচ নম্বর বাড়ী এখন নেই—ঐ স্থানে 'রবীন্দ্র ভারতীর ' 'হল'-গৃহ নির্মিত হয়েছে। মূল বাড়ী অবিশ্যি এখনও অবিকৃত অবস্থায় আছে।

পাঁচ

বৃহৎ পরিবার—জনসংখ্যা বহু। মাতা সারদা দেবীর ঘরকন্নার তত্ত্বাবধান করতেই সময় চলে যায়—ছেলেপিলেদের দেখাশুনা করা আর সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাছাড়া তখনকার দিনের কলকাতার ধনী গৃহের প্রথা মত ছেলেপিলেদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার পড়ল ভৃত্যদের উপর। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে ইহাকে 'ভৃত্যরাজকতন্ত্র' আখ্যা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ, তাঁর দুই-বৎসরের-বড়ো দাদা সোমেন্দ্রনাথ, এবং বড়দিদি সৌদামিনীর ছেলে সত্যপ্রসাদ (দুই বৎসরের বড়ো)—এই তিনজন এক সঙ্গে এই ভৃত্যরাজকতন্ত্রে বড় হয়ে উঠছেন। যে-দুইজন অনুচরের উপর তাঁদের দেখাশুনার ভার ছিল তাদের এক জনের নাম ব্রজেশ্বর বা সংক্ষেপে ঈশ্বর এবং অপরের নাম শ্যাম। ব্রজেশ্বরের কথা ছিল অত্যন্ত বিশুদ্ধ,—কেউ 'বসে আছেন' না বলে সে বলতো 'অপেক্ষা করছেন'। ব্রজেশ্বর সন্ধ্যাবেলায় আফিম খেত, কাজেই তার দুধের প্রয়োজন ছিল। ছেলেদের খাবার দেবার ভার ছিল এই ব্রজেশ্বরের উপর। রাত্রিতে দুধ ও লুচি ছেলেদের কম করে দিয়ে নিজে বাকী অংশটা ভোগ করবে—এমন-ই একটা দুর্বলতা তার মনে ছিল। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে 'জীবনস্মৃতি'তে একটি সরস বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

'আমরা খাইতে বসিতাম। লুচি আমাদের সামনে একটা মোটা কাঠের বারকোশে রাশ-করা থাকিত। প্রথমে দুই একখানি লুচি যথেষ্ট উঁচু হইতে শুচিতা বাঁচাইয়া সে আমাদের পাতে বর্ষণ করিত। দেবলোকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিতান্ত তপস্যার জোরে যে-বর মানুষ

আদায় করিয়া লয় সেই বরের মতো, লুচি কয়খানা আমাদের পাতে আসিয়া পড়িত; তাহাতে পরিবেষণ-কর্তার কুণ্ঠিত দক্ষিণ হস্তের দাক্ষিণ্য প্রকাশ পাইত না। তাহার পর ঈশ্বর প্রশ্ন করিত আরো দিতে হইবে কিনা। আমি জানিতাম, কোন্ উত্তরটি সর্বাপেক্ষা সদুত্তর বলিয়া তাহার কাছে গণ্য হইবে। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয় বার লুচি চাহিতে আমার ইচ্ছা করিত না।'

ছেলেদিগকে সংযত রাখিবার জন্য ব্রজেশ্বর সন্ধ্যেবেলায় রেড়ির তেলের ভাঙা সেজের চারদিকে ছেলেদের বসিয়ে নিয়ে রামায়ণ-ভারত পড়িয়ে শোনাত। চাকরদের মধ্যেও দু' একটি শ্রোতা এসে জুটত। কোনও কোনও দিন রামায়ণ-মহাভারত পাঠের প্রসঙ্গে শাস্ত্র ঘটিত তর্ক উঠলে ঈশ্বর সুগভীর বিজ্ঞতার সঙ্গে তার মীমাংসা করে দিত।

ছোট চাকর শ্যাম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলায়' বলছেন,

'ছোটো কর্তা যে ছিল তার নাম শ্যাম—বাড়ী যশোরে, খাঁটি পাড়াগেঁয়ে, ভাষা তার কলকাতায়ী নয়। সে বলত—তেনারা, ওনারা, খাতি হবে, যাতি হবে, মুগির ডাল, কুলির অম্বল। দোমণি ছিল তার আদরের ডাক। তার রঙ ছিল শ্যাম বর্ণ, বড়ো বড়ো চোখ, তেল চুকচুকে লম্বা চুল, মজবুত দোহারা শরীর। তার স্বভাবে কড়া কিছুই ছিল না, মন ছিল সাদা।. ছেলেদের পরে তার ছিল দরদ।'

এই শ্যাম অনেক সময় একটা গণ্ডী এঁকে তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বসিয়ে দিয়ে বাইরে চলে যেত। তর্জনী তুলে গম্ভীর মুখে বলে যেত, বাইরে গেলেই বিষম বিপদ। বালক রবীন্দ্রনাথ সে-গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করে' বাইরে যেতে সাহস পেতেন না।

ছয়

ছেলেদের লেখাপড়া কীভাবে হওয়া উচিত তার পরিকল্পনা স্থির করা ও তা' কাযে পরিণত করার ভার ছিল সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের উপর। তিনি কড়া শাসনকর্তা ছিলেন। ইংরাজী এবং বাংলা এই দুইয়ের মধ্যে বাংলা প্রথম আরম্ভ করতে হবে এই ছিল তাঁর অভিমত।

ছেলেদের আহারে ও পোষাকে কোনও রকম শৌখিনতার গন্ধ ছিল না। কাপড় চোপড়ের বাহুল্য ছিল না বললেই হয়। বয়স দশের কোঠা পার হবার আগে ছেলেরা পায়ে মোজা পরতে পেত না। শীতকালে গরম জামার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। একটা সুতির জামার উপর আর একটা সুতির জামা পেলেই যথেষ্ট মনে করা হত। বাড়ীর দরজী ছিল নেয়ামত খলিফা—সে জামার মধ্যে দু' একটা পকেট লাগিয়ে দেওয়াও প্রয়োজন মনে করত না, অথবা ঐরূপ জামা তৈরি করার আদেশ-ই হয়ত তার উপর ছিল। রবীন্দ্রনাথ রহস্য করে' তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, 'আমাদের জামার পকেট-যোজনা অনাবশ্যক মনে করিলে দুঃখবোধ করিতাম—কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই, পকেটে রাখিবার মত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই।' এই নেয়ামত দর্জির নাম 'খাপছাড়া'র এক কবিতায় তিনি উল্লেখ করেছেন,

নীলুবাবু বলে, 'শোনো
নিয়ামত দর্জি,
পুরোনো ফ্যাশানটাতে
নয় মোর মর্জি।'
শুনে নিয়ামত মিঞা যতনে পঁচিশটে
সম্মুখে ছিদ্র, বোতাম দিল পৃষ্ঠে।

একজোড়া চটিজুতো দেওয়া হত পায়ে দেবার জন্য। এই ছিল রবীন্দ্রনাথদের বালক বয়সের পোষাক। অতবড় অভিজাত বংশের ছেলেপিলেরা বর্তমানের ছেলেদের তুলনায় যে খুব-ই সামান্য জিনিষ পেত এ-বিষয়ে দ্বিমত নেই। কাজেই রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

'কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল; বড়ো হইলে কোনো-এক সময় পাওয়া যাইবে, এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিষ্যতের জিম্মায় সমর্পণ করিয়া বসিয়াছিলাম। তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহা কিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁঠি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি, তাহারা সহজেই সব জিনিষ পায় বলিয়া তাহার বারো আনাকেই আধখানা কামড় দিয়া বিসর্জন করে—তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নষ্ট হয়।' [জীবনস্মৃতি]

সাত

রবীন্দ্রনাথ শৈশব হতেই ছিলেন কল্পনাপ্রবণ। বাড়ীর দখিনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অথবা গণ্ডীবন্ধনের বন্দীর মত জানালার খড়খড়ি খুলে প্রায় সমস্ত দিন নীচেকার পুকুরটাকে একখানা ছবির বইয়ের মত দেখে কাটিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

'পুকুর গলির ধারে,
বাঁধা ঘাট এক পারে—
কতলোক যায় আসে, স্নান করে, তোলে জল—
রাজহাঁস তীরে তীরে
সারাদিন ভেসে ফিরে,
ডানা দুটি ধুয়ে ধুয়ে করিতেছে নিরমল।'

'পুনর্মিলন'—প্রভাত সংগীত]

'জীবনস্মৃতি'তে এই পুকুর ও স্নানার্থীদের সম্বন্ধে একটি খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন :

'সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙ্গুল চাপিয়া ঝুপঝুপ করিয়া দ্রুতবেগে কতগুলি ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত; কেহ-বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত; কেহ-বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্য বারবার দুই হাতে জল কাটাইযা লইয়া হঠাৎ এক সময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত; কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিত;

কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত; কেহ-বা ব্যস্ত, কোনো মতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ী যাইবার জন্য উৎসুক; কাহারো-বা ব্যস্ততার লেশমাত্র নাই—ধীরে সুস্থে স্নান করিয়া, জপ করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই-তিন বার ঝড়িয়া, বাগান হইতে কিছু-বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ দোদুল-গতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ীর দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়।'

কখনও কখনও তেতলার যে-ঘরে দেবেন্দ্রনাথ থাকতেন সে-ঘরে প্রবেশ করে ঘরের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত সোফার উপরে বসে সারা দুপুরটা কাটিয়ে দেন। কখনও আবার ভোরবেলা ঘুম ভাঙলেই—বিশেষ করে শরৎকালে—বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ঘুরে বেড়ান। এই বাগান ও বাগানে বেড়ান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রভাত সংগীতের 'পুনর্মিলন' কবিতায় বলছেন,

'সে তখন ছেলেবেলা—রজনী প্রভাত হলে,
তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়ি ছুটিয়া যেতেম চলে;
সারি সারি নারিকেল বাগানের এক পাশে,
বাতাস আকুল করে আম্রমুকুলের বাসে।
পথ পাশে দুই ধারে
বেলফুল ভারে ভারে
ফুটে আছে, শিশুমুখে প্রথম হাসির প্রায়—
বাগানে পা দিতে দিতে
গন্ধ আসে আচম্বিতে,
'নর্‌গেস্‌' কোথা ফুটে খুঁজে তারে পাওয়া দায়।'

কখনো দুপুরবেলা খাতাঞ্চিখানার এককোণে রাখা পুরোনো

পরিত্যক্ত একটি পাল্কির মধ্যে প্রবেশ করে' দরজা বন্ধ করে' কল্পনার ডানায় উড়ে' দেশ বিদেশে চলে যান।

কখনও আবার—বিশেষ করে' ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে পড়বার কালে—রেলিংগুলোকে ছাত্র মনে করে নেন এবং ছড়িহাতে তাদের পড়াশুনার তদারক করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

'ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে যখন পড়িতেছিলাম তখন কেবলমাত্র ছাত্র হইয়া থাকিবার যে-দীনতা তাহা মিটাইবার একটা উপায় বাহির করিয়াছিলাম। আমাদের বারান্দার একটি বিশেষ কোণে আমিও একটি ক্লাস খুলিয়াছিলাম। রেলিংগুলা ছিল আমার ছাত্র। একটা কাঠি হাতে করিয়া চৌকি লইয়া তাহাদের সামনে বসিয়া মাস্টারি করিতাম। রেলিংগুলার মধ্যে কে ভালো ছেলে এবং কে মন্দ ছেলে, তাহা একেবারে স্থির করা ছিল। এমন-কি ভালো-মানুষ রেলিং ও দুষ্ট রেলিং, বুদ্ধিমান্ রেলিং ও বোকা রেলিঙের মুখশ্রীর প্রভেদ যেন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতাম। দুষ্ট রেলিংগুলার উপর ক্রমাগত আমার লাঠি পড়িয়া পড়িয়া তাহাদের এমনি দুর্দশা ঘটিয়াছিল যে, প্রাণ থাকিলে তাহারা প্রাণ বিসর্জন করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারিত।'

বাড়ীর উত্তর অংশে একখণ্ড ভূমি পড়ে ছিল—জায়গাটার নাম ছিল 'গোলাবাড়ী'। ছুটির দিনে সুযোগ পেলেই ওখানে গিয়ে তিনি উপস্থিত হতেন। খেলবার জন্যে যে যেতেন এ-কথা বলা যায় না, কারণ সেখানে কখনোও খেলা হত না। জায়গাটারই একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে।

বাড়ীর দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে কতকগুলো ধুলো জমে' ছিল। বালক রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে কয়েকটি আতার বিচি পুঁতে রোজই জল দিতেন এই আশায় যে, একদিন ঐ বিচি থেকে গাছ বেরিয়ে আসবে।

কল্পনাপ্রবণ রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তিও ছিল অসাধারণ। কেউ যে তাঁকে ঠকাতে পারে বা তাঁর কাছে মিথ্যা কথা বলতে পারে এ তাঁর ধারণায় আসত না। একদিন তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ 'পুলিশম্যান' 'পুলিশম্যান' বলে চীৎকার করে তাঁকে ভয় দেখায়—রবীন্দ্রনাথ এমনই ভয় পেয়ে যান যে, অন্দর মহলে ছুটে গিয়ে মায়ের অঞ্চল তলে আশ্রয় নেন। অন্য একদিন সত্যপ্রসাদের ভগ্নী ইরাবতী—রবীন্দ্রনাথের সমবয়স্কা এবং ক্রীড়াসংগিনী—রবীন্দ্রনাথকে খবর দেন যে, বাড়ীর ভিতরে একটা 'রাজার বাড়ী' আছে এবং সে এইমাত্র সেখান থেকে ফিরে' এসেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই 'রাজার বাড়ী'র একটা রহস্যময় রূপেরও সন্ধান দেন। রবীন্দ্রনাথ খুঁজতে আরম্ভ করেন, এবং বলা বাহুল্য যে, সেই 'রাজার বাড়ী' তিনি কখনও খুঁজে পান নি। বড় হয়ে তাই তিনি লিখছেন,

'আমার রাজার বাড়ি কোথায়
কেউ জানেনা সে তো;
সে বাড়ি কি থাকত যদি
লোকে জানতে পেত।'

['রাজার বাড়ী'—শিশু]

আট

এমনি ভাবে রবীন্দ্রনাথ, দাদা সোমেন্দ্রনাথ ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ মানুষ হচ্ছিলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে। পড়াশুনা আরম্ভ হল বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' দিয়ে। সে-যুগে এখনকার মত সুন্দর, মনোগ্রাহী শিশুপাঠ্য পুস্তক ছিল না। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' ও 'বোধোদয়' দিয়েই সকল ছেলের পাঠাভ্যাস আরম্ভ হত। রবীন্দ্রনাথের কবিমন ইতিপূর্বেই কিশোরী চাটুয্যের কাছে ছড়া শুনে মুগ্ধ হয়ে যেত। কিশোরী চাটুয্যে অনেক সময় দাশুরায়ের অথবা স্বরচিত ছড়া শুনিয়ে কিশোর তিনটির—বিশেষ করে' রবীন্দ্রনাথের—মনোরঞ্জন করত এবং মধুকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথকে পাঁচালীর দলে ভর্তি করতে পারবে না বলে দুঃখপ্রকাশ করত। পরিণত বয়সে তিনি একটি কবিতার মাধ্যমে কিশোরী চাটুয্যেকে চিরজীবী করে রেখেছেন ;

কিশোরী চাটুয্যে হঠাৎ জুটত সন্ধ্যা হলে—
বাঁ হাতে তার থেলো হুকো, চাদর কাঁধে ঝোলে।
দ্রুত লয়ে আউড়ে যেত লবকুশের ছড়া—
থাকত আমার খাতা লেখা, পড়ে থাকত পড়া ;
মনে মনে ইচ্ছে হত, যদিই কোনো ছলে
ভরতি হওয়া সহজ হত এই পাঁচালীর দলে,
ভাবনা মাথায় চাপত নাকো ক্লাসে ওঠার দায়ে,
গান শুনিয়ে চলে যেতুম নতুন নতুন গাঁয়ে।

['ভূমিকা'—ছেলেবেলা]

রবীন্দ্রনাথ 'বর্ণ পরিচয়ে'র কর, খল প্রভৃতি কাটিয়ে যখন ছন্দোবদ্ধ প্রথম দুটি পংক্তি,

জল পড়ে,

পাতা নড়ে

পড়েন, সেদিন এক পরম আনন্দের সন্ধান পান। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমার জীবনে এইটিই আদিগুরুর প্রথম কবিতা।' আর একটি ছড়ার পংক্তিও রবীন্দ্রনাকে কৈশোর জীবনে অভিভূত করে— সেটি হচ্ছে

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এলো বান'।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঐ ছড়াটা 'যেন শৈশবের মেঘদূত'।

যাঁর কাছে তিনটি শিশু প্রথম পাঠাভ্যাস আরম্ভ করে তাঁর নাম মাধবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বাড়ী বাঁকুড়া জেলা। আরম্ভ হয় 'বর্ণ-পরিচয়' ও 'বোধোদয়' এই দুইটি পুস্তকের দ্বারা। 'বোধোদয়ে'র নতুন নতুন তথ্য বালক মনকে অভিভূত করে। 'বোধোদয়ে'র পাঠের মাধ্যমে যখন বালক রবীন্দ্রনাথ নীল আকাশের আসল রূপের সন্ধান পান তখন তিনি কীরূপ বিস্মিত হয়েছিলেন তা' 'জীবনস্মৃতি'তে লিপিবদ্ধ করেছেন,

"যেদিন 'বোধোদয়' পড়াইবার উপলক্ষে পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, আকাশের ওই নীল গোলকটি কোনো একটা বাধামাত্রই নহে, তখন সেটা কী অসম্ভব আশ্চর্যই না মনে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, 'সিঁড়ির উপর সিঁড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া যাও না, কোথাও মাথা ঠেকিবে না।' আমি ভাবিলাম সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝি তিনি অনাবশ্যক কার্পণ্য করিতেছেন। আমি কেবলই সুর চড়াইয়া বলিতে লাগিলাম, 'আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি, আরো সিঁড়ি'—শেষকালে যখন বুঝা গেল সিঁড়ির সংখ্যা বাড়াইয়া কোনও লাভ নাই, তখন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম।"

দাদারা ইস্কুলে যান। রবীন্দ্রনাথেরও ইচ্ছা দাদাদের মত ইস্কুলে

গিয়ে পড়াশুনো করেন। কিন্তু অত ছোট ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাতে অভিভাবকেরা নারাজ। একদিন তিনি ইস্কুলে যাবার জন্য বায়না ধরে কাঁদতে থাকেন। তখন মাস্টার মশায় (মাধব মুখোপাধ্যায়) এক চাপড় মেরে রবীন্দ্রনাথকে বলেন, 'এখন ইস্কুলে যাবার জন্য যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার জন্য ইহার চেয়ে অনেক বেশী কাঁদিতে হইবে।' রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর শিক্ষকের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে' যায়।

কান্নার জোরে রবীন্দ্রনাথ 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী'তে ভর্তি হন। সে-যুগে ইংরাজী পড়ার ইস্কুলগুলো সবই ছিল হয় সরকারী নয় খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত। গৌরদাস আঢ্য নামে একজন হিন্দু যুবক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে 'ওরিয়েন্টাল সেমিনারী' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করে। ইংরেজী ভাষা শিখলেও যাতে ছেলেরা জাতীয় আদর্শচ্যুত না হয়, ইহাই ছিল ঐ বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য। গৌরদাস আঢ্য নিজে খুব উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না বলে ইংরেজ শিক্ষকের দ্বারা ইংরেজী শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করেন। গৌরদাস আঢ্যের সুষ্ঠু পরিচালনায় বিদ্যালয়টি উন্নতি লাভ করে এবং তখনকার হিন্দুসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখনকার কলকাতার সমাজে বিদ্যালয়টি কী পরিমাণ খ্যাতি লাভ করেছিল তা' 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় প্রকাশিত নিম্নের এই কয়টি পংক্তি থেকেই বুঝা যাবে ঃ

অতএব নিবেদন করি মহাশয়।
বালককে শিখাইতে বাঞ্ছা যার হয়
উচিত তাহার ঐ স্থানেতে পাঠান।
রাখিয়া আপন ধর্ম হইবে বিদ্বান॥

[সমাচার চন্দ্রিকা ঃ ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১ ঃ দ্রষ্টব্য ঃ কলিকাতার সংস্কৃতি কেন্দ্র—যোগেশচন্দ্র বাগল]

এই বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু এখানে

বেশিদিন তাঁদের থাকা হয় না। অল্প কিছুদিন পরেই তিনিটি বালককে 'নর্মাল স্কুলে' ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়।

নর্মাল স্কুলে রবীন্দ্রনাথ খুব তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ঠাকুর বাড়ীর ছেলেদের প্রতি বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদের আচরণ খুবই অশোভনরূপে প্রকাশ পায়। বাড়ীর গাড়ীতে বিদ্যালয়ে আসা, পোষাক-পরিচ্ছদে চাল-চলনে আভিজাত্য প্রকাশ, কথার্বার্তার বিশিষ্ট ভঙ্গী—এ-সব হয়ত বিদ্যালয়ের ছেলেদের ভালো লাগত না। ছেলেদের উপদ্রবের জন্য বালক রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন টিফিনের সময় বাড়ীর চাকরের সাথে দোতলার রাস্তার দিকের এক জানালার ধারে বসে' থেকেই সময় কাটিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন সাত-আট বৎসর।

নর্মাল স্কুলে পড়াশুনো হত বিলাতী ইস্কুলের অনুকরণে। বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হবার প্রথমেই সকল ছেলেকে গ্যালারীতে বসে একটি গান করতে হত। গানের ভাষা ছেলেদের মুখে এমন বিকৃত রূপ নিয়েছিল যে তা' বুঝা খুবই কঠিন ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবন-স্মৃতি'তে বলছেন,

'আমাদের মুখে সেই ইংরেজিটা কী ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কেবল একটি লাইন মনে পড়িতেছে—

কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।

অনেক চিন্তা করিয়া ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি —কিন্তু কলোকী কথাটা যে কিসের রূপান্তর তাহা আজও ভাবিয়া পাই নাই। বাকী অংশটা আমার বোধ হয়—

Full of glee, singing merrily, merrily, merrily.'

ওরিয়েন্টাল স্কুলের শাস্তিদান পদ্ধতি বালক রবীন্দ্রনাথের মনকে

বিরূপ করে তুলেছিল—ওখানকার শাস্তিদান ছিল ছেলেদের হাতের উপর কতকগুলো শ্লেট চাপিয়ে দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা। নর্মাল স্কুলের ছাত্রদের আচরণ, শিক্ষকদের ব্যবহার, পাঠদান পদ্ধতি—কোনটাই রবীন্দ্রনাথের বালক মনে মধুর স্মৃতির রেখাপাত করতে পারে নি। ছাত্রদের আচরণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কয়েক-জন শিক্ষকও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন নি। অথচ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত। হরনাথ পণ্ডিত নামে একজন শিক্ষক ক্লাসে এমন অশিষ্ট ভাষা প্রয়োগ করতেন যে বালকের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। হরনাথ পণ্ডিতের ক্লাসে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁর ইচ্ছে করত না। ক্লাসের প্রান্তে বসে নানা রকম উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় নিয়ে হরনাথ পণ্ডিতের ঘণ্টাটা কাটিয়ে দিতেন। প্রথম বৎসরই বাৎসরিক পরীক্ষায় বাংলা ভাষায় তিনি ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষক ছিলেন মধুসূদন বাচস্পতি। ক্লাসের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানান যে, পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্বের জন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রথম হতে পেরেছেন, যোগ্যতার জন্য নয়। আবার পরীক্ষা নেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়—এবার পাহারায় থাকেন ইস্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গোবিন্দবাবু স্বয়ং। এবারও রবীন্দ্রনাথ সর্বোচ্চ নম্বর পান।

নর্মাল স্কুলের সকল শিক্ষকই যে এমন সহানুভূতিহীন ও নিন্দনীয় চরিত্রের ছিলেন তা নয়। কয়েকজন শিক্ষক তাঁর সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছেন বলে তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে লিপিবদ্ধ করেছেন। সাতকড়ি দত্ত বলে একজন শিক্ষক ছিলেন—তিনি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি নিজে ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথ সে-সময় থেকেই কবিতা লিখতে অভ্যাস করছেন—দাদা সোমেন্দ্রনাথের মাধ্যমে স্কুলে সে-সংবাদ ভালো

ভাবেই প্রচারিত হয়েছে। এ-খবর সাতকড়ি দত্তের কানেও পৌঁছায়। তিনি একদিন রবীন্দ্রনাথকে ডেকে জানতে চাইলেন যে, সত্যিসত্যি সে কবিতা লিখতে পারে কিনা। রবীন্দ্রনাথ কবিতা লেখার কথা স্বীকার করলে তিনি তাঁকে মাঝে মাঝে পাদপূরণের জন্য দু'এক পংক্তি করে কবিতা দিতেন। একবার নীচেকার দু'পংক্তি দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাদপূরণ করে আনতে বলেন :

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই,
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ পাদপূরণ করেন এই ভাবে :

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে,
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে।

বলা বাহুল্য, সাতকড়ি দত্ত খুবই খুশী হন।

আর একজন ছিলেন গোবিন্দবাবু—কালো রঙ, বেঁটে এবং মোটা। তিনি ছিলেন স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। একবার ছেলেদের জ্বালাতনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে গোবিন্দবাবুর ঘরে প্রবেশ করে তিনি কাঁদতে থাকেন। গোবিন্দবাবু সেদিন থেকে বালক রবীন্দ্রনাথকে খুবই করুণার চক্ষে দেখতেন। তিনি একবার রবীন্দ্রনাথকে একটি নীতিমূলক কবিতা লিখে আনবার জন্য ফরমায়েশ করেন। কবিতা লিখে আনা হলে তিনি বালককে নিয়ে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে যান, এবং তাঁকে ক্লাসে সুমুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কবিতাটি পড়ে শোনাতে বলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির তিনি প্রশংসা করেন, কিন্তু তিনি চলে গেলে অন্যান্য ছেলেরা ঈর্ষাবশতঃ এটা অন্যের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা নয়, এই কথা প্রচার করে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে।

নর্মাল স্কুলে পড়া হয় ছাত্রবৃত্তির নীচেকার ক্লাস পর্যন্ত—বোধ হয়

বর্তমান পঞ্চম শ্রেণী। হঠাৎ তাদের নর্মাল স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাষায় তাঁদের নর্মাল স্কুল ছাড়ার পর্বটা 'জীবন স্মৃতি'তে বর্ণনা করেছেন :

'আমাদের নর্মাল স্কুলের পালা হঠাৎ শেষ হইয়া গেল। তাহার একটু ইতিহাস আছে। আমাদের বিদ্যালয়ের কোনো-একজন শিক্ষক কিশোরীমোহন মিত্রের রচিত আমার পিতামহের ইংরেজী জীবনী পড়িতে চাহিয়াছিলেন। আমাব সহপাঠী ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ সাহসে ভর করিয়া পিতৃদেবের নিকট হইতে সেই বইখানি চাহিতে গিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, সর্বসাধারণের সঙ্গে যে-প্রাকৃত বাংলায় কথা কহিয়া থাকি সেটা তাঁহার কাছে চলিবে না। সেইজন্য সাধু গৌড়ীয় ভাষায় এমন অনিন্দনীয় রীতিতে সে বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল যে, পিতা বুঝিলেন, আমাদের বাংলা ভাষা অগ্রসর হইতে হইতে শেষ কালে নিজের বাংলাত্বকেই প্রায় ছাড়াইয়া যাইবার জো করিয়াছে।'

এর পরেই ছেলেদিগকে নর্মাল স্কুল হতে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা হয়, এবং ডি ক্রুজ (De Cruz) সাহেবের 'বেঙ্গল একাডেমি' নামক এক ফিরিঙ্গী স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয়। ইংরেজী ভাষা শেখা ফিরিঙ্গীদের স্কুলেই ভালো হবার সম্ভাবনা বেশী এই ধারণার বশবর্তী হয়েই অভিভাবকেরা ছেলে তিনটিকে এই স্কুলে দেন। রবীন্দ্রনাথ সর্বকনিষ্ঠ সন্তান—বুধেন্দ্রনাথ জন্মের এক বছরের মধ্যেই মারা যায়—কাজেই বাড়ীর সকলের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র। রবীন্দ্রনাথের নিজেরও স্কুলের প্রতি আকর্ষণ কম। কাজেই স্কুলে যাওয়া থেকে না যাওয়ার দিনই বেশী হয়ে উঠতে লাগল। আর বেঙ্গল একাডেমিতে অনুপস্থিত থাকার সুবিধাও প্রচুর। স্কুল কর্তৃপক্ষ নিয়মিত মাইনে পেলেই খুশী থাকেন। ছেলেদের উপস্থিতি-অনুপস্থিতি সম্বন্ধে বিদ্যালয়ে বিশেষ

কোনও কড়াকড়ি নিয়ম নেই। কাজেই রবীন্দ্রনাথ স্কুলে না গেলেও কারো কাছে জবাবদিহী করতে হয় না, কেবল একটি দরখাস্ত দিতে পারলেই হয়। দরখাস্ত লিখবার একজন লোকও পাওয়া গেল— তিনি দাদাদের ফারসী পড়াতেন, মুন্সী বলে' তাঁকে ডাকা হত। তিনি ছিলেন খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়েই সব দরখাস্ত লিখিয়ে নিতেন—বালক যে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে তাঁকে দিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে নিচ্ছেন এ ধারণা তাঁর কখনো হত না।

'বেঙ্গল একাডেমি'র ফিরিঙ্গী ছাত্ররাও ভদ্র ছিল না। তারা হাতের তেলোতে 'Ass' কথাটা উল্টো করে লিখে হঠাৎ এসে বালকের জামার পিঠের উপর ছাপ দিয়ে দিত, কখনো কখনো কলা থেৎলিয়ে মাথার উপর ঘষে দিত, আবার কখনো বা ধাঁ করে চাপড় দিয়ে অত্যন্ত নিরীহ ভালো মানুষটির মত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকত, দেখে পরম সাধু বলে ভ্রম হত।

'বেঙ্গল একাডেমী'র একটি ছাত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে-ছেলেটি ম্যাজিক দেখাতে পারত এবং নিজের নামে একখানা বইও ছাপিয়েছিল। ঠাকুর বাড়ীর ছেলেরা সেই ছেলে-টিকে ইস্কুলে যাবার সময় নিজেদের গাড়ীতে তুলে নিয়ে যেতেন এবং মাঝে মাঝে নিজেদের বাড়ীতেও নিয়ে আসতেন। নিজের লেখা বই, তা আবার ছাপা হয়েছে এবং বইয়ের উপরে নাম ছাপার হরফে এমন একটি ছাত্রের সঙ্গে পরিচয় আছে বলে কিশোর রবীন্দ্রনাথ নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন। তখনো রবীন্দ্রনাথের কোন রচনা ছাপা হয়নি। দু' একটি যাদুবিদ্যা শিখে নেবার জন্য রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে হল। একদিন তিনি জানতে পারলেন যে, মনসা বীজের আঠা কোনও বীজের গায়ে একুশ বার মাখিয়ে নিয়ে শুকালেই সে-বীজ হ'তে

এক ঘণ্টার মধ্যে গাছ বেরিয়ে আসে এবং ফল প্রদান করে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসপ্রবণ মন তখনই পরীক্ষা করতে প্রবৃত্ত হল। একটি মালীকে দিয়ে প্রচুর পরিমাণ মনসা সিজের আঠা সংগ্রহ করে একটি আমের আঁঠির উপরে লাগিয়ে শুকুতে দেন। গাছ যে বার হয়নি তা' বলার বোধ হয় দরকার নেই।

এই বেঙ্গল একাডেমিতেও বেশী দিন পড়া হয়নি।

মাঝখানে কিছুদিন কোনও স্কুলে যাওয়া হয়নি--বাড়ীতেই পড়াশুনো চলত। কিছুদিন ছেদ পড়ার পর আবার তিনজনকেই ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। রবীন্দ্রনাথের স্কুলের প্রতি পূর্বের মতই বিতৃষ্ণা। ইস্কুলে নিয়মিত যাওয়া হয় না. কিংবা গেলেও বিদ্যালয়ের পাঠক্রম মোটেই ভালো লাগে না। এই সময়ে মাও মারা যান— তখন রবীন্দ্রনাথের চৌদ্দ বছর বয়স। মাতৃ-হারা এই ছেলেটিকে সকলেই স্নেহের চোখে দেখেন, বিশেষ করে দিদি ও বৌদিদিরা। কাজেই বালকের স্কুল পালাবার আরও সুবিধে হল। সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে দু'বছর তিনি কোনও রকমে কাটিয়ে দেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। বিদ্যালয়ের পাঠাভ্যাসও সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হল। সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল ত্যাগ করার সময় তিনি পড়তেন 'ফিফথ ইয়ার' বা 'প্রিপ্যারেটরী এণ্ট্রান্স' ক্লাসে।

সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের দুজন শিক্ষকের কথা তিনি তাঁর 'জীবন স্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন। একজনের নাম ফাদার ডি পেনেরাণ্ডা। লোকটি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। ইংরিজী উচ্চারণ ভালো করতে পারতেন না বলে ছেলেরা তাঁর ক্লাসে বিশেষ মনোযোগ দিত না। ছাত্রদের ঔদাসীন্যে তিনি মনে খুবই ব্যথা পেতেন, কিন্তু নীরবে তা সহ্য করে যেতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ ক্লাসে বসে আছেন, একটা

জিনিস লিখতে দেওয়া হয়েছিল, তিনি কিন্তু কিছুই না লিখে চুপচাপ বসে আছেন। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের পিঠে হাত রেখে তিনি অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করেন, 'টাগোর, তোমার শরীর কি ভালো নেই ?' রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষকের স্নেহপূর্ণ আচরণ কখনও ভুলতে পারেন নি। আর একজন শিক্ষক ছিলেন—তাঁর নাম ফাদার হেনরি। সকল ছেলেরাই তাঁকে ভালোবাসতো।

সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল ছাড়ার পরে এদেশে আর কোনও স্কুলে রবীন্দ্রনাথের পড়া হয় নি। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের জীবন আরম্ভ হয়েছিল সাত-আট বৎসর বয়সে 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী'তে প্রবেশ করা থেকে, আর শেষ হয় পনেরো বৎসর বয়সে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। এই ছাত্রজীবনও আবার একটানা নয়—মাঝে মাঝে নানা কারণে ছেদ পড়ে। তাঁর সত্যিকার পাঠাভ্যাস এবং বিদ্যালাভ হয় গৃহে বিচিত্ররূপে, এবং এই শিক্ষাদান হয় বিদ্যালয়ে পড়বার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে। গৃহে শিক্ষাদানের পরিকল্পনাকারী এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রধানতঃ মেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ।

॥ নয় ॥

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হেমেন্দ্রনাথের অভিমত ছিল প্রথমে বাংলা ভাষায় ভালো করে গোড়াপত্তন করে পরে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষাদান। হেমেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ও নির্দেশ মত গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল বিচিত্ররূপে। গৃহশিক্ষার এই আয়োজনকে রবীন্দ্রনাথ 'নানা বিদ্যার আয়োজন' এই আখ্যা দিয়েছেন। সূর্য উঠবার আগেই ঘুম থেকে উঠতে হত এবং 'লংটি' পরে হীরা সিং নামে একজন কাণা শিখ পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি লড়তে হত। পরে ঐ মাটিমাখা শরীরের উপরই জামা পরিধান করে গিয়ে বসতে হত বিদ্যাভ্যাসে ফরাস-পাতা পড়বার ঘরে। নর্মাল স্কুলের শিক্ষক নীলকমল ঘোষাল এ-সময় পড়াতে আসতেন। সকাল ছ'টা থেকে বেলা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত ছিল পড়বার সময়। নীলকমল ঘোষালের শরীর ছিল ক্ষীণ ও শুষ্ক, কিন্তু কণ্ঠস্বর ছিল তীক্ষ্ণ। রবীন্দ্রনাথ একটু রহস্য করে বলেছেন, 'তাঁহাকে মানুষজন্মধারী একটি ছিপ্‌ছিপে বেতের মতো বোধ হইত।' পাঠ্য পুস্তক ছিল অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ', রামগতি ন্যায়রত্নের 'বস্তু বিচার', সাতকড়ি দত্তের 'প্রাণী বৃত্তান্ত' এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। তা ছাড়াও পড়তে হত পদার্থবিদ্যা, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল। দুপুর বেলায় যেতে হত স্কুলে। স্কুল থেকে ফিরে এলেই বসতে হত ড্রয়িং এবং জিমনাষ্টিকের মাস্টার মশায়ের কাছে। সন্ধ্যে হলেই পড়তে হত ইংরেজী—পড়াতেন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র অঘোরবাবু। সকাল ছ'টা থেকে রাত্রি ন'টা পর্যন্ত প্রায় অবকাশ নেই বললেই হয়।

রবিবার গান শিখতে হত বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে মাঝে মাঝে আসতেন সীতানাথ দত্ত যন্ত্র সহযোগে প্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে। এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথের খুবই ভালো লাগত, তার প্রধান কারণ সীতানাথ দত্ত বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন হাতে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন স্মৃতিতে' লিখছেন,

'জ্বাল দিবার সময় পাত্রের নীচের জল পাতলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারী জল নীচে নামিতে থাকে, এবং এই জন্যই জল টগবগ করে—ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পষ্ট মনে আছে।'

ক্যাম্পবেল (বর্তমান নীলরতন সরকার কলেজ্) মেডিক্যাল স্কুলের একটি ছাত্র অস্থিবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে যেত। পড়বার ঘরে তার-দিয়ে জোড়া একটি নরকঙ্কাল টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল পড়াবার সুবিধা হবে বলে।

এতসব বিদ্যাভ্যাসের মাঝে আবার হেরম্ব তত্বরত্ন এসে মুগ্ধবোধের সূত্র অভ্যাস করাতেন।

মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র পড়াতে আসতেন ইংরেজী একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁর দায়িত্বজ্ঞান ছিল খুবই প্রখর। পড়ানোটা সরস এবং আনন্দদায়ক করবার জন্য তিনি খুবই চেষ্টা করতেন। ছেলেদের—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের—মনোযোগ প্রায়ই থাকত না। ভাষাটা ইংরাজী আর সময়টা সন্ধ্যাবেলা—কাজেই সময়টা রবীন্দ্রনাথের খুবই কষ্টে কাটত। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

'আমরা যেমনি পড়া শুরু করিতাম অমনি মাথা ঢুলিয়া পড়িত। চোখে জলসেক করিয়া, বারান্দায় দৌড় করাইয়া, কোনো স্থায়ী ফল হইত না এমনি সময় বড় দাদা যদি দৈবাৎ স্কুল ঘরের বারান্দা

দিয়া যাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইতেন তবে তখনই ছুটি দিয়া দিতেন। ইহার পরে ঘুম ভাঙিতে আর মুহূর্ত-কাল বিলম্ব হইত না।'

মাস্টার মশায় এই অমনোযোগী ছাত্রদের লজ্জা দিবার জন্য অপর একটি সুবোধ ছাত্রের দৃষ্টান্ত তাঁদের সুমুখে উপস্থাপিত করতেন, কিন্তু ঐরূপ জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত চোখের সুমুখে ধরা সত্বেও মনোযোগের দিক থেকে তাঁদের বিশেষ উন্নতি হত না।

মাঝে মাঝে এই সন্ধ্যার ইংরেজী শিক্ষার আসর থেকে মুক্তি পাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মন আকুল হয়ে উঠত, কিন্তু কোনও উপায় ছিল না। রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ছিল অত্যন্ত ভালো। ম্যালেরিয়া কাকে বলে তা তাঁর জানা ছিল না, অসুখ বিসুখ ছেলে বয়সে কখনো হয় নি—এমন কি, মাথাও কখনও ধরে নি। রোদে পুড়ে এবং বৃষ্টিতে ভিজেও কোনও রোগকে ডেকে আনা যায় নি। মাস্টার মশায়েরও স্বাস্থ্য এত ভালো যে, তিনিও কখনও অনুপস্থিত হতেন না। ফলে সন্ধ্যার ইংরেজীর আসর থেকে মুক্তি পাওয়া এক রকম অসম্ভবই ছিল। কোনও কোনও বর্ষাকালের দিনে প্রবল বর্ষণ কালে ছাত্রের মনের কোণে ক্ষীণ আশা উঁকি দিত, হয়ত এই দুর্যোগে মাস্টার মশায় নাও আসতে পারেন। আসবার দু'এক মিনিট বিলম্ব হলে আশা থেকে মনে আনন্দেব সঞ্চার হত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ বিষাদে পরিণত হত, কারণ মাস্টার মশায়ের চির-পরিচিত ছাতাটি গলির মোড়ে প্রায় নির্দিষ্ট সময়েই দৃষ্টিগোচর হত। পড়তে হত প্যারীচরণ সরকারের ইংরেজী বই—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। এখনকার মত ছেলেদের বইয়ে পাতায় পাতায় ছবি থাকত না। রবীন্দ্রনাথ রহস্য করে বলছেন,

'প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ের দেউড়িতেই থাকে-থাকে সার-বাঁধা

সিলেবাস-ফাঁক-করা বানানগুলো অ্যাকসেন্ট-চিহ্নের তীক্ষ্ণ সঙিন উঁচাইয়া শিশুপাল বধের জন্য কাওয়াজ করিতে থাকিত। ইংরেজি-ভাষার এই পাষাণ দুর্গে মাথা ঠুকিয়া আমরা কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিতাম না।'

হেমেন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে এইভাবে এই তিনটি বালকের গৃহে বিদ্যাভ্যাস হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন স্মৃতি'তে বিদ্যাভ্যাসের এই আয়োজন নিয়ে একটু পরিহাস করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথই আবার অন্যত্র স্বীকার করেছেন যে, শৈশবে এই বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় পড়ার ফলেই তাঁর বাংলা ভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের সৃষ্টি হয়।

এ-সব 'ঘরের পড়া' চলতে থাকে নর্মাল স্কুলে পাঠকালীন অবস্থায়। স্কুলের পড়াই হোক আর বাড়ীর পড়াই হোক কোথাও বালক রবীন্দ্রনাথের মন বসতে চায় না। পড়াশুনোর গণ্ডীতে আবদ্ধ হবার মত মনই নেই। তখন বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ নিজে তাঁকে পড়াতে আরম্ভ করেন। তিনিও কৃতকার্য হন না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুরোধে রাজনারায়ণ বসুও কিছুকাল অধ্যাপনা কার্যে লিপ্ত হন—ফল একই প্রকার। অতঃপর গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হলেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি, এ পাশ করেছিলেন। তিনিও প্রথম প্রথম রবীন্দ্রনাথের পড়াশুনোর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হন না—তখন তিনি পড়াবার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' তখন রবীন্দ্রনাথকে পড়ানো হচ্ছিল। তিনি প্রথমে বাংলায় অর্থ করে পড়িয়ে দিতেন, পরে রবীন্দ্রনাথকে নিজে নিজে পড়তে হত। এভাবে 'কুমারসম্ভবে'র প্রায় তিন সর্গ রবীন্দ্রনাথের মুখস্থ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে পড়ানো হচ্ছিল সেক্‌স্‌পীয়ারের

'ম্যাকবেথ' নাটক। 'ম্যাকবেথ' আবার বাংলা ছন্দে তর্জমাও করিয়ে নিতেন বালকের দ্বারা। 'কুমারসম্ভবে'রও বাংলা ছন্দে অনুবাদ করিয়ে নিতেন কিনা তা সঠিক্ বলা যায় না। এমনিভাবে গোটা 'ম্যাকবেথ'টাই ছন্দোবদ্ধ হয়ে যায় বলে শোনা যায়। 'ম্যাকবেথে'র অনুবাদের কিছুটা অংশ পরে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রামসর্বস্ব পণ্ডিত মহাশয়ের :উপর ভার ছিল সংস্কৃত পড়াবার। তিনি প্রথমে ব্যাকরণ পড়াতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ব্যাকরণের প্রতি রবীন্দ্রনাথেব মন কিছুতেই আকৃষ্ট করতে না পারায় কালিদাসের 'শকুন্তলা' পড়াতে আরম্ভ করেন। তিনি একদিন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যান বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে তাঁকে এই বালক-কবির রচিত 'ম্যাকবেথে'র ছন্দে অনুবাদ শুনাবার জন্য। সে-সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে উপবিষ্ট ছিলেন কবি রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়। দুজনেই রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবদ্ধ 'ম্যাকবেথে'র অনুবাদ শুনে খুবই খুশী হন। রাজকৃষ্ণ রায় দু'এক জায়গায়—বিশেষ করে ডাকিনীদের উক্তির স্থলে—কিছু কিছু পরিবর্তনের উপদেশ দেন।

জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য কিছুদিন পরে গৃহশিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দিয়ে আইন পড়তে যান। তখন পড়াতে আসেন মেট্রপলিটান স্কুলের শিক্ষক ব্রজনাথ দে মহাশয়। তিনি এসে গোল্ডস্মিথের 'ভিকার অব ওয়েকফীল্ড' তর্জমা করে পড়াতে আরম্ভ করেন।

এইভাবে বালক রবীন্দ্রনাথের: ঘরে এবং বাইরে পাঠাভ্যাস ও বিদ্যার্জনের চেষ্টা চলতে থাকে। সুদূরপ্রসারী বালক-কবির মনকে এ-ভাবে নির্দিষ্ট পাঠক্রমের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করার চেষ্টা কার্যতঃ সফল হয় না।

পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে অন্যান্য অনেক বই পড়েছিলেন। তখন বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকের সংখ্যা বেশী ছিল

না, শিশুপাঠ্য পুস্তক প্রায় ছিল না বললেই হয়। তাহলেও যে-পুস্তক তিনি পেতেন তাই পড়ে ফেলতেন, সে-বই বড়দের জন্যই হোক কি ছোটদের জন্যই হোক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে এ-সম্বন্ধে লিখছেন,

'আমার বাল্যকালে বাংলা সাহিত্যের কলেবর কৃশ ছিল। বোধ করি, পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে-কয়টা ছিল সমস্তই আমি শেষ করিয়াছিলাম। তখন ছেলেদের এবং বড়োদের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই। আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে শিশুদের জন্য সাহিত্য রসে প্রভূত পরিমাণে জল মিশাইয়া যে-সকল ছেলে ভুলানো বই লেখা হয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা হয় না। ছেলেরা যে-বই পড়িবে তাহার কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না, এইরূপ বিধান থাকা চাই। আমরা ছেলেবেলায় একধার হইতে বই পড়িয়া যাইতাম; যাহা বুঝিতাম এবং যাহা বুঝিতাম না, দুই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়া যাইত।'

তখন রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' নামে একখানি ছবি-ওয়ালা মাসিক পত্র প্রকাশ করতেন। এই পত্রিকার একখানা বাঁধানো খণ্ড হেমেন্দ্রনাথের ঘরে আলমারীতে রাখা ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই পত্রিকা বার করে এনে বহুবার পড়েন এবং অত্যন্ত আনন্দ পান। তিনি লিখেছেন, 'সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোশের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমি মৎস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারীর উপন্যাস পড়িতে পড়িতে কত ছুটির দিনের মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।'

আর একটি পত্রিকাও সে-সময়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথ আনন্দ পেয়ে

ছিলেন—তার নাম ‘অবোধবন্ধু’। এই পত্রিকার খণ্ডগুলি বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের আলমারি থেকে বার করে এনে দক্ষিণ দিকের ঘরের খোলা দরজার কাছে বসে বসে পড়তেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচিতি হয় এই পত্রিকার মাধ্যমেই, এবং বালক রবীন্দ্রনাথের কবিমন বিহারীলালের গীতিকবিতা পাঠ করে বহিঃপ্রকৃতির সুরের সঙ্গে সুর মেলাবার প্রেরণা পায়। এই কাগজে ‘পৌলবর্জিনী’ গল্পের অনুবাদ বার হয়। মূল ফরাসী থেকে এ-গল্পের অনুবাদ করেন অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। ঐ গল্প পড়ে বালক রবীন্দ্রনাথ অনেক দিন অশ্রুবিসর্জন করেছেন। বালকদের পাঠের অনুচিত এমন দু’একখানা বইও তিনি পড়েছেন—তার মধ্যে একখানা হল দীনবন্ধু মিত্রের ‘জামাই বারিক’ প্রহসন। সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ‘প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ’ও রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তিনি আরও কয়েকখানি বই পড়েন, যেমন ‘মৎস্য নারীর কথা’, ‘সুশীলার উপাখ্যান’ ও ‘রবিন্‌সন ক্রুসো’। ‘রবিন্‌সন ক্রুসো’ তাঁর খুবই ভালো লেগেছিল। ডিকেন্সের ‘ওল্ড কিউরিসিটি শপ’ও তিনি পড়েছিলেন যখন ইংরিজী ভালো করে বুঝতেন না তখনই।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন এগারো বৎসর, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বঙ্গদর্শন’ বার হয়। রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্মৃতি’তে এ-সম্পর্কে বলেছেন,

“অবশেষে বঙ্কিমের ‘বঙ্গদর্শন’ আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও বেশী দুঃসহ হইত। বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, এখন যে-খুশি সে-ই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া ফেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন মাসের পর মাস কামনা করিয়া, অপেক্ষা করিয়া, অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘ কালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত

করিয়া—তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার সুযোগ আর-কেহ পাইবে না।"

'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে' প্রকাশিত বিদ্যাপতির কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো লাগত। মৈথিলী পদগুলো দুর্বোধ বলেই কিশোর কবির মনকে খুবই আকর্ষণ করত। টীকা-টীপ্পনীর উপর নির্ভর না করে বালক রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা' বুঝে নেবার চেষ্টা করতেন—দুরূহ শব্দগুলির অর্থ এবং ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্য একটি বাঁধানো খাতায় লিখে রেখে সযত্নে রক্ষা করতেন।

॥ দশ ॥

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, রবীন্দ্রনাথের শৈশবের ভৌগোলিক সীমা ছিল অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ। ভৃত্যমহলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘর, বাড়ীর আঙ্গিনা ও ভিতরের বাগান, মূল বাড়ীর কয়েকটি কক্ষ, দক্ষিণের ও পশ্চিমের বারান্দা, তেতলায় দেবেন্দ্রনাথের কক্ষ এবং উপরের ছাদ—এই কয়টি মিলিয়েই ছিল রবীন্দ্রনাথের শৈশব-জগৎ। এ-ভাবে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় বাইরের প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড রূপ তাঁর চোখের সুমুখে পড়ে' বিপুল বিশ্ব ও প্রকৃতির সন্ধান জানিয়ে দিত। বহিঃপ্রকৃতির সাথে পরিচিত হবার ইচ্ছে হত খুব, কিন্তু সুযোগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে বলছেন,

'বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ, শব্দ, গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক ফুকর দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ।'

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন দশ, তখন প্রথম তিনি বাড়ীর বাইরে যাবার এক সুযোগ পান। সে-সময় কলকাতায় প্রচণ্ড ডেংগুজ্বরের আক্রমণ হয়। ঠাকুর পরিবারের কিছু অংশ কলকাতার কিছু উত্তরে অবস্থিত পেনেটিতে (পানিহাটি) ছাতুবাবুদের বাগান বাড়ীতে আশ্রয় নেয়—রবীন্দ্রনাথও এদের মধ্যে একজন ছিলেন। গঙ্গার উপরেই বাড়ীটি—একটি ছোট বাগান, বাগানে কয়েকটি পেয়ারা গাছ, পাশেই চাকরদের ঘর। পেছনে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা খিড়কীর পুকুর—তাতে বাঁধানো ঘাট, ঘাটের পাশে মস্ত একটা জামরুল গাছ আর চারিদিক নানা রকম ফলের গাছে পরিপূর্ণ। সামনেই গঙ্গা। সমগ্র দৃশ্যটা ছবির

মত কিশোর কবির চোখের স্থমুখে ফুটে উঠত। রবীন্দ্রনাথ তন্ময় হয়ে গঙ্গাতীরে বসে সে-ছবি উপভোগ করতেন। পরে তিনি একটি কবিতায় এই বাগান ও গঙ্গাতীরের কথা উল্লেখ করেছেন:

'আরেকটি ছোটো ঘর মনে পড়ে নদীকূলে,
সম্মুখে পেয়ারাগাছ ভরে আছে ফলে ফুলে।
বসিয়া ছায়াতে তারি ভুলিয়া শৈশবখেলা,
জাহ্নবীপ্রবাহ-পানে চেয়ে আছি সারাবেলা।'

['পুনর্মিলন'--প্রভাত সংগীত]

'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখছেন,

'পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার-ভাঁটার আসা যাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারা গাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণ-বক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিতপ্লাবন। এক-একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে; ওপারের গাছগুলি কালো; নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করে; নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলির মধ্যেই যা-খুশি-তাই করিয়া বেড়ায়।'

এখানেও এসে গণ্ডীর বাঁধন ঘুচল না। বাড়ীর বাইরে যাওয়া নিষেধ। বাড়ীর মধ্যে থেকে এবং গঙ্গাতীরে বসে' যতদূর সম্ভব দেখে নিচ্ছেন বাইরের প্রকৃতির সৌন্দর্য। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হত বাড়ীর বাইরে লোকালয়ের মধ্যে যেতে, কিন্তু উপায় ছিল না অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া বাইরে যাবার। একদিন সকালে তাঁর দু'জন বয়স্ক

অভিভাবক বাইরে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথেরও ইচ্ছে হল তাঁদের সঙ্গে গিয়ে একটু ঘুরে' আসেন—তিনি তাঁদের পেছনে পেছনে যেতে লাগলেন। কিছু পরেই অভিভাবকেরা টের পেলেন যে, বালক তাদের সঙ্গে আসছে। তাঁদের মধ্যে একজন মৃদু ভর্ৎসনা করে' তাঁকে ফিরে যেতে বললেন যেহেতু বাইরে যাবার মত সাজসজ্জা ছিল না—পায়ে ছিল না মোজা আর গায়ে ছিল না ভদ্র কোনও আচ্ছাদন। মোজা এবং অতিরিক্ত আচ্ছাদন ঠাকুর বাড়ীর ছেলেদের সাধারণ সাজ-সজ্জার অন্তর্গত ছিল না, বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে তাঁরা তা পরতে পেতেন। কাজেই তিরস্কার হজম ক'রে ফিরে যাওয়া ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোনও উপায় ছিল না।

ওখানে কিছুদিন কাটিয়ে তাঁরা সকলেই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ফিরে আসেন।

॥ এগারো ॥

বহিঃপ্রকৃতির সাথে বাল্যকালে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সুযোগ পান উপনয়নের পর। পিতা দেবেন্দ্রনাথ বৎসরের অধিকাংশ সময় কলকাতার বাইরে ভারতের বিভিন্ন স্থানে কাটাতেন—বিশেষ ক'রে হিমালয়ের ক্রোড়ে। একবার তিনি স্থির করেন সংসার ত্যাগ করে শিমলা পাহাড়েই বাস করবেন এবং ভগবানের সাধনায় চিরজীবন কাটিয়ে দেবেন। একদিন একটি ছোট পার্বত্য নদীর তীরে বসে ওর কুলুকুলু শব্দে যেন ভগবানের বাণী শুনতে পেলেন। তাঁর মনে হ'ল ভগবান যেন এই নদীর দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁকে সংসারে ফিরে যেতে বলছেন। নদীর জন্ম পর্বতে, কিন্তু সে এখানেই চিরকাল থাকে না—সেত সমতল ভূমিতে অবস্থিত কত কত জনপদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েই পরে সাগরে গিয়ে মিলিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ যেন শুনতে পেলেন ভগবান তাঁকেও সংসারের মধ্যে থেকেই ব্রহ্মের উপাসনা করার জন্য আদেশ দিচ্ছেন। দেবেন্দ্রনাথের সংসার পরিত্যাগ করা হল না, কিন্তু তাহলেও তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে দীর্ঘকাল থাকা পছন্দ করতেন না, বাইরে বাইরেই ঘুরে বেড়াতেন।

দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী লোক। তিনি যখন অল্প কিছুদিনের জন্য জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে এসে তেতলার ঘরে থাকতেন, তখন বাড়ীর সকলে অত্যন্ত সন্ত্রস্তভাবে চলাফেরা করত। রবীন্দ্রনাথের মাতা সারদা দেবী নিজে রান্নাবান্নার তদারক করতেন, বয়স্কেরা পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে থাকতেন আর ছোটদের উপরে আদেশ ছিল তারা যেন কোনও রকম গোলমাল করে' তাঁর বিরামভঙ্গ না করে। বালক রবীন্দ্রনাথের সময় কাটত ভৃত্যমহলে, পিতার কাছে পৌঁছানো তাঁর প্রায়ই সম্ভব হত না।

রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন এগারো বৎসর নয় মাস তখন তাঁর উপনয়ন হয়। পিতা এলেন দুই ছেলে, সোমেন্দ্র ও রবীন্দ্র, এবং দৌহিত্র সত্যপ্রসাদের উপনয়ন দেবার জন্য। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে তিনি বৈদিক মন্ত্র হতে উপনয়নের অনুষ্ঠান সংকলন করে নেন। ঠাকুর পরিবারের অনুষ্ঠান এ-পর্যন্ত হিন্দুশাস্ত্র মতেই হত, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ অপৌত্তলিক মতে (অর্থাৎ শালগ্রাম শিলার উপস্থিতি ছাড়া) অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করেন। মাঘোৎসবের অল্প কিছুদিন পরেই উপনয়ন কার্য সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে বেদান্তবাগীশ মহাশয় পুরোহিতের ও দেবেন্দ্রনাথ আচার্যের কাজ করেন। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে এই উপনয়ন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বলেন,

'নূতন প্রবর্তিত উপনয়ন-পদ্ধতিতে গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষাপূর্বক উপবীত গ্রহণ করার নিয়ম প্রবর্তিত হইল। পৌত্তলিকতা ছাড়া ব্রাহ্মণ্য সকল নিয়ম পালন করিয়া উপনয়ন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।'

উপবীত গ্রহণের তিন দিন তেতলার ঘরে আবদ্ধ থাকাকালীন সময়টা ছেলেদের আনন্দেই কেটে গেল। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে তার একটি সরস বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

'মাথা মুড়াইয়া বীরবৌলি পরিয়া, আমরা তিন বটু তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবদ্ধ হইলাম। সে আমাদের ভারি মজা লাগিল। পরস্পরের কানের কুণ্ডল ধরিয়া আমরা টানাটানি বাধাইয়া দিলাম। একটা বাঁয়া ঘরের কোণে পড়িয়াছিল ; বারান্দায় দাঁড়াইয়া যখন দেখিতাম নিচের তলা দিয়া কোনো চাকর চলিয়া যাইতেছে ধপাধপ শব্দে আওয়াজ করিতে থাকিতাম, তাহারা উপরে মুখ তুলিয়াই আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ মাথা নিচু করিয়া অপরাধ-আশংকায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইত।'

উপবীত গ্রহণ করার পর গায়ত্রীমন্ত্র জপ করার দিকে রবীন্দ্রনাথের একটা প্রবল আগ্রহ জন্মে। যদিও তিনি মন্ত্রের অর্থ ভালো করে বুঝতেন না, তাহলেও মন্ত্র পড়তে পড়তে অনেক সময় অশ্রু বিসর্জন করতেন। পরজীবনে রবীন্দ্রনাথের মনের উপরে বেদ ও উপনিষদ্ যে-প্রভাব বিস্তার করেছিল তার প্রথম অংকুরোদগম হয় রবীন্দ্রনাথের মনে এই কিশোর বয়সেই।

॥ বারো ॥

উপনয়ন কার্য সম্পন্ন হয়ে গেল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি 'বেঙ্গল একাডেমি'র ছাত্র। নেড়া মাথা নিয়ে কী করে বিদ্যালয়ে যাবেন, ফিরিঙ্গী ছাত্ররা তাঁর মুণ্ডিত মস্তক দেখলে তাঁর প্রতি কীরূপ আচরণ করবে এ-সব ভাবনায় পড়ে গেলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে এ-সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। পিতা দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে তেতলার ঘরে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁর সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণে যেতে রবীন্দ্রনাথ রাজী আছেন কিনা। আসন্ন বিপদ হতে মুক্তির এই সম্ভাবনায় তাঁর মন আনন্দে নেচে উঠল। তিনি সানন্দে পিতার প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করলেন।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ কখনো রেলগাড়ীতে চড়েন নি। ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের সে-অভিজ্ঞতা হয়েছে—সে এব আগেই একবার রেলগাড়ীতে চেপে বোলপুর থেকে ঘুরে এসেছে। রেলগাড়ীতে চড়ে যাওয়া যে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার এ-সংবাদ রবীন্দ্রনাথ সত্যপ্রসাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে একটু চিন্তায়ই পড়লেন। সত্যপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে জানালো যে, রেলগাড়ীর কামরায় উঠাই এক বিপজ্জনক

কাজ—দৈবাৎ পা ফসকালেই আর রক্ষে নেই, মৃত্যু অবধারিত। কামরায় উঠতে পারলেই যে সমস্যার সমাধান হল, তাও নয়। গাড়ী এত দ্রুতগতিতে চলে যে, প্রাণপণে নিজের নিজের আসন জাপটে ধরে না বসলে কে কোথায় ছিটকে পড়বে, তার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। কিশোর রবীন্দ্রনাথের মন সকল কথা বিশ্বাস করে। কিছুটা ভয়ে ভয়েই তিনি হাওড়া স্টেশনে গেলেন। বাড়ী থেকে যাত্রা করবার বর্ণনা 'জীবনস্মৃতি' থেকে দেওয়া গেল :

"বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার সময় পিতা তাঁহার চির-রীতি অনুসারে বাড়ীর সকলকে দালানে লইয়া উপাসনা করিলেন, গুরুজন-দিগকে প্রণাম করিয়া পিতার সঙ্গে গাড়ীতে চড়িলাম। আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোশাক তৈরি হইয়াছে। কী রঙের কিরূপ কাপড় হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। মাথার জন্য একটা জরির-কাজ-করা গোল মখমলের টুপি হইয়াছিল। সেটা আমার হাতে ছিল, কারণ নেড়া মাথার উপর টুপি পরিতে আমার মনে মনে আপত্তি ছিল। গাড়ীতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন, 'মাথায় পরো।' পিতার কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি হইবার জো নাই। লজ্জিত মস্তকের উপর টুপিটা পরিতেই হইল।"

সত্যপ্রসাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে বালক রবীন্দ্রনাথের রেলগাড়ীতে উঠতে একটু ভয়ই হয়েছিল, কিন্তু অতি সহজেই গাড়ীতে উঠতে পারলেন বলে কিছুটা বিস্মিতই হলেন। আরও বিস্মিত হলেন যখন গাড়ীটা চলতে আরম্ভ করল, কারণ সত্যপ্রসাদের বর্ণনা মত কারো আসন থেকে ঠিকরে পড়ার মত অবস্থা হল না।

পরিকল্পনা ছিল বোলপুর শান্তিনিকেতনে কিছুদিন থেকে পরে তাঁরা হিমালয় যাবেন। বোলপুরে গাড়ী পৌঁছলো সন্ধ্যার একটু পরে। স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতন যেতে হবে পাল্কিতে

চেপে। পাল্‌কিতে উঠে রবীন্দ্রনাথ চোখ বুজে রইলেন। এত অল্পবয়সেই তিনি এতটা ভাবপ্রবণ ছিলেন যে, তিনি স্থির করলেন বোলপুরে পৌঁছে রাতে তিনি কিছুই দেখবেন না—সকাল বেলায় চোখ মেলে বোলপুরের সমস্ত সৌন্দর্য তিনি একসঙ্গে দেখে নেবেন।

দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন-আশ্রম স্থাপনার একটু ইতিহাস আছে। শান্তিনিকেতন তখন ছিল বীরভূমের একটি ছোটগ্রাম, রায়পুরের সিংহপরিবারদের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতেন। একদিন রায়পুরে যাবার পথে এই স্থানটি তাঁর চোখে পড়ে। প্রকাণ্ড প্রান্তর,—তুইটি ছাতিম গাছ এবং কয়েকটি খেজুর গাছ ছাড়া অন্য কোন বৃক্ষ নেই বললেই হয়। একটি রাস্তা—নাম চীপ সাহেবের রাস্তা—চলে গেছে সুরুল থেকে গুনুটিয়া পর্যন্ত। পূর্বে কাটোয়া এবং বীরভূমের এই অঞ্চলে নীলকুঠি ছিল এবং নীলকরেরা থাকত। গুনুটিয়াতে ঐরূপ একটি নীলকুঠি ছিল। এই প্রান্তর দেবেন্দ্রনাথের খুব পছন্দ হয়, ওখানে নির্জন বাস ও ভগবানের সাধনা করা সম্ভব হবে বলে'। ছাতিম গাছের পার্শ্ববর্তী বিশ বিঘা জমি তিনি রায়পুরের সিংহ-পরিবারের কাছ থেকে ক্রয় করেন। পরে একটি ছোট একতলা বাড়ী নির্মাণ করেন। জায়গাটা যখন ক্রয় করা হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তুই বছরেরও কম। দেবেন্দ্রনাথ যখন প্রথম এই অঞ্চলে যান তখনো রেল লাইন হয় নি। তিনি কিভাবে ওখানে যেতেন তা' একটা সমস্যার বিষয়। প্রভাতকুমার তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে বলেছেন যে, দেবেন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ নৌকায় ক'রে কাটোয়া হয়ে গুনুটিয়া পর্যন্ত যেতেন। পরে ওখান থেকে পাল্‌কি চেপে চীপ সাহেবের রাস্তা ধরে ও-সব অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছুতেন। রবীন্দ্রনাথ যখন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যান তার কিছু পূর্বে রেল লাইন হয়েছে।

ভোরবেলা উঠে রবীন্দ্রনাথ বাইরে এলেন। ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ আরও দু'একটি সংবাদ দিয়েছিল। সত্যপ্রসাদ বলেছিল যে, শান্তিনিকেতন একটা অদ্ভুত স্থান। বাসগৃহ থেকে রান্নাঘরে যাবার একটা রাস্তা আছে তার উপরে কোনও আবরণ নেই, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে তা সত্ত্বেও গায়ে রোদ বৃষ্টি কিছুই লাগে না। রবীন্দ্রনাথ রাস্তাটি খুঁজে বার করবার অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু ইরাবতীর 'রাজার বাড়ী'র মতই কখনো তা' খুঁজে পান নি। সত্য-প্রসাদ প্রদত্ত আর একটি খবর ছিল যে, শান্তিনিকেতনের চতুর্দিকের মাঠে সব সময়েই ধান ফ'লে থাকে, এবং ধান থেকে চাল সংগ্রহ ক'রে রাখাল বালকদের সঙ্গে একসাথে বসে খাওয়া একটা বেশ মজার খেলা। বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কোনও ধান ক্ষেত দেখতে পেলেন না।

বালক রবীন্দ্রনাথ এখানে এসে অবাধ স্বাধীনতা পেলেন। ঈশ্বর বা শ্যামের কোনও শাসন এখানে নেই, নেই কোনও গণ্ডীর বন্ধন। অবারিত মাঠ, নীল আকাশ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, সেখানে যাবার কোনও বাধা নেই আজ। জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে পিতা দেবেন্দ্রনাথের কাছে যেতে বালক রবীন্দ্রনাথের সাহস হত না, কিন্তু এখানে পিতাকে পেলেন অত্যন্ত কাছে,—নিবিড় স্নেহের সংস্পর্শে পিতাকে অত্যন্ত আপন, একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী হিসেবেই পেলেন।

শান্তিনিকেতনের চারপাশে তিনি একা একা ঘুরে বেড়ান নির্ভয়ে। বীরভূমের অনেক স্থানে বৃষ্টির জলে উপরকার বালি ও মাটি ক্ষয় হয়ে নীচেকার পাথর বেরিয়ে পড়ে—এই খাদগুলোকে বলা হয় 'খোয়াই'। রবীন্দ্রনাথ কাছাকাছি খোয়াই থেকে ছোট ছোট পাথর এনে বাবাকে দেখাতেন। পিতা উৎসাহ দিয়ে আরও নুড়িপাথর আনতে তাঁকে আদেশ করতেন। কখনও খোয়াইয়ের ঝরণা দেখে এসে পিতার

কাছে আবদার করতেন ঐ ঝরণা থেকে খাবার জল আনতে। পিতাও তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য ওখান থেকেই জল আনবার বন্দোবস্ত করতেন। এমনি ভাবে পিতাপুত্রের সম্পর্ক নিকট ও নিবিড় হয়ে উঠল

দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষাদানপদ্ধতি ছিল অত্যন্ত সুন্দর। বালকের দায়িত্বজ্ঞান এবং নিজের উপর আস্থা যাতে জন্মে সেই জন্য বালক রবীন্দ্রনাথের উপর কতকগুলো কাজের ভার দিলেন। টাকা পয়সার হিসেব রাখা এবং ঘড়িতে প্রত্যহ দম দেওয়া—এ দু'টি কাজ তাদের মধ্যে অন্যতম।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলে পড়বার কালেই কবিতা লেখা আরম্ভ করেছেন। শান্তিনিকেতনের নির্জন আবাসে তিনি একটি কাব্য লেখা আরম্ভ করেন—নাম 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়'। বাগানের প্রান্তে একটি নারকেল গাছের তলায় মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে কবিতা লিখতেন। তাঁর ছেলেবয়সে লেখা অনেক কবিতা এবং কাব্য পাওয়া গেছে, কিন্তু এই কাব্যটির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নি। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

"তৃণহীন কংকর-শয্যায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' বলিয়া একটা বীররসাত্মক কাব্য লিখিয়াছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত কাব্যটাকে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই।"

॥ তেরো ॥

কিছুদিন শান্তিনিকেতনে থেকে পরে এলাহাবাদ, কানপুর হয়ে তাঁরা অমৃতসরে যান। পথের মধ্যে একটি ঘটনা ঘটে—তা' দেবেন্দ্রনাথের ন্যায়নিষ্ঠতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা প্রমাণ করে। কোনও একটা স্টেশনে গাড়ী থামলে টিকেট পরীক্ষক গাড়ীতে উঠে টিকেট পরীক্ষা করে। রবীন্দ্রনাথের বয়স বারোর নিচে কিনা এ-বিষয়ে তার সন্দেহ হয়, কিন্তু সে তা' মুখে প্রকাশ না ক'রে আর একজন টিকেট পরীক্ষককে নিয়ে আসে। উভয়ে কিছুক্ষণ থেকে কিছু না বলে চলে যায়। পরে স্টেশন মাস্টার নিজে এসে দেবেন্দ্রনাথকে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের বয়স বারোর বেশী ব'লেই তাদের মনে হয়। বারো বছরের বেশী নয়, একথা বলা সত্ত্বেও কর্মচারীটি পুরো ভাড়া দাবী করে। দেবেন্দ্রনাথ অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে নোট বার ক'রে দেন। পরে ভাড়া কেটে নিয়ে বাকী টাকা ফেরত দিতে এলে দেবেন্দ্রনাথ ছুঁড়ে তা' প্লাটফরমের উপর ফেলে দেন।

অমৃতসরে পৌঁছে পিতা দেবেন্দ্রনাথ পুত্রকে নিয়ে শিখ গুরুদ্বারে যেতেন এবং শিখদের সঙ্গে ভজনগানে যোগদান করতেন। শিখরা এঁদের খুবই সমাদর করত এবং মিছরি ও হালুয়া দিয়ে অভ্যর্থনা করত। একদিন দেবেন্দ্রনাথ শিখ গুরুদ্বারের একজন গায়ককে বাড়ীতে এনে গান শোনেন এবং পুরস্কৃত করেন। এ-খবর রটে গেলে বাড়ীতে কেবলই গায়কের আগমন হতে লাগল, এবং বাড়ীতে আসা বন্ধ করে দেওয়া হলে তানপুরা কাঁধে নিয়ে গায়কেরা রাস্তার মাঝেই দেখা করে গান আরম্ভ করে দিত।

অমৃতসরে দেবেন্দ্রনাথ মাসখানেক থাকেন। বালক রবীন্দ্রনাথের

অধ্যয়নের ব্যাঘাত না হয়, সেজন্যে কয়েকখানা বইও সঙ্গে নিয়েছিলেন। অবসর সময়ে সে-সব বই নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে পড়াতে বসতেন। ইংরেজী পড়াবার জন্য নিয়েছিলেন Peter Parley's Tales পর্যায়ের অনেকগুলো বই। তিনি সেগুলো পড়াতে আরম্ভ করলেন এবং যে-সব জায়গায় সমালোচনাযোগ্য বিষয় ছিল, সেখানে তিনি সমালোচনা করে বালকের যুক্তিবাদী মনোবৃত্তি বিকাশের সহায়তা করতেন। সংস্কৃত শেখাবার জন্য 'ঋজুপাঠ-দ্বিতীয় ভাগ' এবং 'উপক্রমণিকা' আরম্ভ করেন। এ-ছাড়া প্রকটরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজী জ্যোতিষগ্রন্থ থেকে পড়ে শোনাতেন, এবং মুখে মুখে বুঝিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথকে তা' বাংলায় লিখতে হত। রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিষ সম্বন্ধে এই রচনা থেকে পরে 'ভারতীতে' কিছু কিছু ছাপা হয়।

পিতা দেবেন্দ্রনাথ নিজে পড়তেন গিবনের বিখ্যাত 'রোমের ইতিহাস'—বৃহদাকার এবং কয়েকখণ্ডে বাঁধানো। রবীন্দ্রনাথ এ-সম্বন্ধে 'জীবনস্মৃতি'তে বলছেন,

'আমি মনে ভাবিতাম, আমাকে দায়ে পড়িয়া অনেক জিনিস পড়িতে হয়, কারণ আমি বালক, আমার উপায় নাই—কিন্তু ইনি তো ইচ্ছা করিলেই না পড়িলেই পারিতেন, তবে এ দুঃখ যেন।'

॥ চৌদ্দ ॥

অমৃতসরে মাসখানেক থেকে তাঁরা হিমালয়ের দিকে রওনা হলেন। স্থির হল থাকা হবে ড্যালহৌসী পাহাড়ে। ঝাঁপানে ক'রে তাঁরা পাহাড়ে উঠেন। ড্যালহৌসী পৌঁছে বক্রোটা-নামক শৈলশিখরের উপর অবস্থিত একটি বাংলো বাড়ীতে তাঁরা অবস্থান করেন। সঙ্গে ছিল কিশোরী চাটুয্যে, যার কাছে ছড়া শুনে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হতেন।

খরচ-পত্রের হিসেব এবং ক্যাসবাক্সের ভার রইল বালক রবীন্দ্রনাথের উপর। রবীন্দ্রনাথ যে খুব হিসেবে পাকা ছিলেন তা' নয়, এ ভার দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথের দায়িত্বজ্ঞান বাড়াবার জন্য।

তখন বৈশাখ মাস,—তাহলেও শীত অত্যন্ত প্রবল। স্থানে স্থানে তখনও বরফ জমে আছে, বিশেষ ক'রে সে-সব জায়গায় যেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না। এখানেও ভ্রমণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি পেলেন। তাঁর সাহসিকতা যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্যে পিতা তাঁকে একা একা পাহাড়ে ভ্রমণ করতে কোনও বাধা দেন না। রবীন্দ্রনাথের লোহার-ফলা-দিয়ে-বাঁধা একটি লাঠি ছিল—ঐ লাঠিটি নিয়ে তিনি পর্বতের উপর পদচারণায় বহির্গত হতেন। আনন্দ পেতেন প্রচুর।

ভ্রমণ, পাঠাভ্যাস, আহার ও বিশ্রাম—এভাবে দিনটা কেটে যেত। খুব ভোরে—সূর্যোদয়ের পূর্বে—ঘুম থেকে উঠে মুখস্থ করতে হত 'উপক্রমণিকা'র শব্দরূপ। পরে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পিতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে উপনিষদের মন্ত্রপাঠ শেষ ক'রে একবাটি দুধ খেতে হত। দুধ খাওয়া শেষ হলে পিতার সঙ্গে ভ্রমণে বেরুতে হত। দেবেন্দ্রনাথ দ্রুত হাঁটতে পারতেন—বালক রবীন্দ্রনাথ সমতালে

চলতে অসমর্থ হয়ে অনেক সময় মাঝপথ থেকেই বাড়ীতে ফিরে আসতেন। দেবেন্দ্রনাথ ফিরে এসে বসতেন ইংরেজী পড়াতে। তারপর দশটার সময় বরফগলা ঠাণ্ডা জলে স্নান। গরমজল মিশিয়ে স্নান করা ছিল বারণ। পিতা দেবেন্দ্রনাথ প্রচুর পরিমাণে দুধ খেতেন, এবং রবীন্দ্রনাথকেও প্রচুর দুধ খেতে দিতেন। 'ভৃত্যরাজকতন্ত্রে' ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে অল্প পরিমাণ দুধ খেয়ে যা' অভ্যাস হয়েছিল তা' ফেরানো অসম্ভব। অথচ বাটি-ভর্তি দুধ দেওয়া হত তাঁকে খেতে। তখন তিনি ভৃত্যদের শরণাপন্ন হতেন, তারা 'দয়া করিয়া বা নিজের প্রতি মমতা বশতঃ বাটিতে দুধের অপেক্ষা ফেনার পরিমাণ বেশী করিয়া দিত'।

দুপুর বেলা ছিল একা একা ভ্রমণের সময়। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি'তে লিখছেন,

'বনস্পতিগুলা প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের কতশত বৎসরের বিপুল প্রাণ। কিন্তু এই সেদিনকার অতি ক্ষুদ্র একটি মানুষের শিশু অসংকোচে তাহাদের গা ঘেঁষিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা একটি কথাও বলিতে পারে না। বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা, এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।'

মাঝে মাঝে দেবেন্দ্রনাথ বালকের সঙ্গে নানা রকম কৌতুকজনক গল্প করতেন। আরো আগেকার দিনের বড়মানুষরা কিরূপ সৌখীন ছিলেন তার দৃষ্টান্ত দিতেন। ঢাকাই মসলীনেরও পাড় ছিঁড়ে তাঁরা পরতেন পাড়টা কর্কশ লাগত বলে। আর গয়লার গল্প, যে-গয়লা দুধে

জল মেশাত বলে পরিদর্শক নিযুক্ত হল দুধ তার পরীক্ষা করে' নেবার জন্য। আবার পরিদর্শক ঠিক ভাবে তার কাজ করছে কিনা তা' দেখবার জন্য আরো একজন পরিদর্শক নিযুক্ত হল। পরিদর্শকের সংখ্যা যত বাড়তে লাগল দুধেও জলের পরিমাণ তত বাড়তে লাগল। একদিন গয়লা বাবুকে জানাতে বাধ্য হল যে, পরিদর্শকের সংখ্যা আরো বাড়লে দুধের মধ্যে জল দিয়ে কুলানো যাবে না, গুগলীও মিশিয়ে দিতে হবে।

এমনি ভাবে অতি আনন্দে কয়েকমাস কাটিয়ে কিশোরী চাটুয্যের সঙ্গে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

হিমালয় থেকে ফিরে আসার পর বাধা নিষেধের গণ্ডী অনেকটা শিথিল হয়ে গেল। এখন আর ভৃত্যমহলে বন্দী থাকতে হয় না। অন্দর মহলে, বিশেষ ক'রে মায়ের ঘরে, একটা বড় আসন দখল করে নিলেন। মেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয়েছে, তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবী ছোট দেবরটিকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখেন। নানা রকম বই পড়ে নতুন নতুন তথ্য যা' জানতে পারেন মায়ের কাছে তা' বলে কৃতিত্বলাভের একটা প্রয়াস বালকের মনে জেগে উঠে। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখছেন,

'নর্মাল স্কুলে পড়িবার সময় যেদিন কোনো-একটি শিশুপাঠে প্রথম দেখা গেল, সূর্য পৃথিবীর চেয়ে চৌদ্দলক্ষগুণে বড়ো সেদিন মাতার সভায় এই সত্যটাকে প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহাতে প্রমাণ হইয়াছিল, যাহাকে দেখিতে ছোটো সেও হয়তো নিতান্ত কম বড়ো নয়।'

'ঋজুপাঠে' বাল্মীকী রামায়ণের যে অংশটুকু আছে, তা' পড়ে' বালকের মনে লোভ হল মাকে জানাতে যে. তিনি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ছাড়াও সংস্কৃত মূল রামায়ণ সবটাই পড়েছেন। মা' শুনে খুব খুশি হলেন এবং একটু গৌরবান্বিতাও বোধ করলেন।

॥ পনেরো ॥

বাড়ীতে সাহিত্য ও সংগীত চর্চা করছেন দাদারা এবং তাঁদের বন্ধুবর্গ। তাছাড়া বাংলার প্রবীণ সাহিত্যিক ও জননেতারাও এসে মাঝে মাঝে সম্মিলিত হচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথ খুব ছোটবয়স থেকেই তা' উপভোগ করছেন আনাচে কানাচে থেকে। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা স্ফুরণে সাহায্য করছেন তাঁর দাদা ও বৌদিদিরা। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন আত্মভোলা, উদাসীন, দার্শনিক ও কবি, সাংসারিক কাজকর্মে খুবই অবহেলা। বাড়ীর দক্ষিণেব বাবান্দায় তাঁর সাহিত্যের আসর—লিখছেন গীতিকাব্য 'স্বপ্নপ্রয়ান'। সবসময় কাব্যরচনায় মশগুল, দিলখোলা মানুষের হাসিতে আসর সরগরম। কাগজের পর কাগজে কবিতা লিখে যাচ্ছেন, ভালো না লাগলে ছিঁড়ে ফেলে বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছেন। রাখছেন যা' তার চেয়ে অনেক বেশী নষ্ট করছেন। কবিতা লিখে জোরে জোরে আবৃত্তি করছেন, আর বালক-কবির কানে এসে তা' পৌঁছে মনের মধ্যে আলোড়ন জাগাচ্ছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবী বালক রবীন্দ্রনাথকে একরকম হাতে ধরে' সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ করান। কাদম্বরী দেবীর অবারিত স্নেহ ও অফুরন্ত উৎসাহ কবি-প্রতিভার বিকাশে অতিমাত্রায় সহায়তা করে। জ্যোতিদাদা ছিলেন এক সঙ্গে তাঁর সাহিত্যের গুরু, পথ-প্রদর্শক, বন্ধু ও সাহিত্য রচনার সঙ্গী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা আবিষ্কার করেন এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যোতিদাদা সম্বন্ধে বলছেন,

'জ্যোতিদাদা যাঁকে আমি সকলের চেয়ে মানতুম, বাইরে থেকে

তিনি আমাকে কোনো বাঁধন পরান নি। তাঁর সঙ্গে তর্ক করেছি, নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি বয়স্যের মতো। তিনি বালককেও শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আমার আপন মনের স্বাধীনতার দ্বারাই তিনি আমার চিত্ত বিকাশের সহায়তা করেন।' [আত্মপরিচয়]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্য মজলিশে একজন আসতেন যাঁর প্রভাবও রবীন্দ্রনাথের কবিমনের উপর কম বিস্তার লাভ করে নি। তাঁর নাম অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী। প্রভাতকুমার এই অক্ষয় চৌধুরী সম্বন্ধে বলেন ঃ

'ইনি ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী ও প্রায়-সমবয়স্ক বন্ধু, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ হইতে এগারো-বারো বৎসরের বড়। প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজ অধ্যাপকের নিকট ইংরেজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াও বাংলা সাহিত্যের রসগ্রহণে তাঁহার আদৌ বাধা ছিল না। তাঁহার অসামান্য রসানুভূতির শক্তিবলে তিনি রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে কাব্য-বিচারের একটি সুষ্ঠু মানসূচী ধরিয়াছিলেন। সে-যুগের ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষার তীব্র উত্তেজনাকে তিনিই রবীন্দ্রনাথের কাছে মূর্তিমান্ করিয়া তোলেন, এবং বোধহয় তাঁহারই প্রেরণায় তিনি সে-যুগের পক্ষে আধুনিক ইংরেজ কবিদের কবিতা বাংলা ছন্দে ও ভাষায় অনুবাদ করিতে সমর্থ হন।' [রবীন্দ্রজীবনী]

আর কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। তিনি ত ঠাকুরবাড়ীর সকলেরই অতি প্রিয় কবি ও শ্রদ্ধার পাত্র। বিহারীলালের গীতিকাব্য 'সারদামঙ্গল' ঠাকুর বাড়ীর সকলেরই হাতে হাতে ফিরে। কাদম্বরী দেবীর কাছে তিনি আদর্শ কবি—প্রিয় দেবরকে তাঁরই ছাঁচে তৈরী করবার চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিহারীলালের কবিতা পড়ে অত্যন্ত আনন্দ পান। বহুজায়গায় রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, এবং তাঁর কবি-প্রতিভা যে বিহারীলালের

কবিতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে তা' স্বীকার করেছেন। বিহারীলাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে যা' বলেছেন তার একটু উদ্ধৃতি করা হল :

'কবির (বিহারীলালের) সঙ্গে আমারও বেশ একটু পরিচয় হইয়া গেল। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দিনে-দুপুরে যখন-তখন তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাঁহার হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত—তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল—তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনই তাঁহার কাছে গিয়াছি, সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিযাছি।'

পাশের বাড়ীতে প্রায়ই অভিনয় ও সংগীতানুষ্ঠান হত। ছোট বালকদের যদিও সেখানে যাবার কোনও অনুমতি ছিল না, তাহলেও দূর থেকে তা' শুনে এবং কিছুটা দেখে ছেলেরা আনন্দ পেত। বাড়ীর আঙিনায় মাঝে মাঝে যাত্রাভিনয় হত—তাতেও ছোট ছেলেদের যাওয়া বারণ ছিল। একবার এমনি একটা যাত্রাভিনয়ে উপস্থিত থাকার অনুমতি পেয়ে বালক রবীন্দ্রনাথের মনে কিরূপ আনন্দ হয়েছিল তা তাঁর নিজের ভাষায়ই বর্ণনা করা যাক :

"সব-তাতে মানা করাটাই বড়োদের ধর্ম। কিন্তু একবার কী কারণে তাঁদের মন নরম হয়েছিল, হুকুম বেরোল ছেলেরাও যাত্রা শুনতে পাবে। ছিল 'নলদময়ন্তী'র পালা। আরম্ভ হবার আগে রাত এগারোটা পর্যন্ত বিছানায় ছিলুম ঘুমিয়ে। বার বার ভরসা দেওয়া হল, সময় হলেই আমাদের জাগিয়ে দেবে। উপরওয়ালাদের দস্তুর জানি, কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। কেন না, তাঁরা বড়ো, আমরা ছোটো।

"সে রাত্রে নারাজ দেহটাকে বিছানায় টেনে নিয়ে গেলুম। তার একটা কারণ, মা বললেন, তিনি স্বয়ং আমাকে জাগিয়ে দেবেন। আর একটা কারণ ন'টার পরে নিজেকে জাগিয়ে রাখতে বেশ একটু ঠেলা-ঠেলির দরকার হত। এক সময়ে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমাকে নিয়ে আসা হল বাইরে। চোখে ধাঁধা লেগে গেল। একতলায় দোতলায় রঙিন ঝাড় লণ্ঠন থেকে ঝিলিমিলি আলো ঠিকরে পড়ছে চার দিকে, সাদা বিছানো চাদরে উঠোনটা চোখে ঠেকছে মস্ত। একদিকে বসে আছেন বাড়ীর কর্তারা আর যাদের ডেকে আনা হয়েছে। বাকি জায়গাটা যার খুশি যেখান থেকে এসে ভরাট করেছে। থিয়েটরে এসেছিলেন পেটে-সোনার-চেন-ঝোলানো নামজাদার দল।" [ছেলেবেলা]

॥ ষোল ॥

রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় বলেছেন,

'মানুষ-আকারে বদ্ধ যে-জন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাঁহারে কাঁপায় স্তুতি-নিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাঁহার জীবন-চরিতে।'

[উৎসর্গ]

আমরা এ-পর্যন্ত কিশোর রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথাই আলোচনা করেছি। এবার আমরা তাঁর কবিত্ব-শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ সম্বন্ধে কিছুটা জানবার চেষ্টা করি।

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার উন্মেষ হয় অতি ছেলেবেলায়। রবীন্দ্রনাথের যখন সাত-আট বৎসর বয়স, সে-সময় তাঁর এক ভাগ্নে

জ্যোতিঃপ্রকাশ এসে তাঁকে বলেন যে কবিতা লিখতে হবে। জ্যোতিঃপ্রকাশ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের খুড়তুতো বোন (গিরীন্দ্রনাথের কন্যা) কাদম্বিনী দেবীর পুত্র, বয়সে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ছ' বছরের বড়। কবিতা কী ক'রে লিখতে হয় সে-বিষয়ে তিনি শিক্ষাদান আরম্ভ করলেন এবং পয়ার ছন্দে কবিতারচনা পদ্ধতিটি বুঝিয়ে দিলেন। ববীন্দ্রনাথ কোনও একজন কর্মচারীর কাছ থেকে একটি নীল কাগজের খাতা সংগ্রহ ক'রে পেন্সিল দিয়ে কবিতা রচনা আবম্ভ করলেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'হরিণ শিশুর নূতন শিং বাহির হইবাব সময় সে যেমন যেখানে-সেখানে গুঁতা মারিয়া বেড়ায়, নূতন কাব্যোদ্গম লইয়া আমি সেইরকম উৎপাত আরম্ভ করিলাম।'

দাদা সোমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থেকে দু'বছরের বড়ো, একসঙ্গেই চলাফেরা করেন। সোমেন্দ্রনাথ ছোট ভাইয়েব কবিত্বশক্তিতে অত্যন্ত গৌবব অনুভব করছেন, এবং দুজনে মিলে জমিদারী কাছারীর আমলাবর্গের কাছে কবিতা শুনিয়ে তাদের বিস্মিত করে দিচ্ছেন। একদিন 'ন্যাশনাল পেপার' সংবাদপত্রের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র ঠাকুরবাড়ীতে এসেছেন। সোমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে ধ'রে তাঁর কাছে নিয়ে বালক-কবিকে দিয়ে তাঁর স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করিয়ে শোনান—মনে মনে আশা তিনিও বিস্মিত হয়ে যাবেন। সেই কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ 'ভ্রমর' শব্দটি ব্যবহার না ক'রে বোধ হয় মাইকেলের অনুকরণে 'দ্বিরেফ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। নবগোপাল মিত্র শুধু 'দ্বিরেফ' শব্দটির অর্থ জিজ্ঞেস করে একটু হেসে প্রস্থান করেন। রবীন্দ্রনাথ রহস্য ক'রে বলছেন, "নবগোপাল বাবু হাসিলেন বটে, কিন্তু 'দ্বিরেফ' শব্দটা মধুপানমত্ত ভ্রমরেরই মতো স্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল।"

তখন রবীন্দ্রনাথ নর্মাল স্কুলের ছাত্র। কবি-খ্যাতি দাদা

সোমেন্দ্রনাথের মাধ্যমে বিদ্যালয়েও রটে গেল। শিক্ষক সাতকড়ি দত্তের কবিতার পাদপূরণ করে এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গোবিন্দবাবুর আদেশে নীতিমূলক কবিতা লিখে ছাত্রবৃত্তিক্লাসের ছাত্রদের কাছে কী রকম অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তা' পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময়ে তিনি একটি হাসির কবিতাও লিখেছিলেন ঃ

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।

রায়পুরের লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রায়ই ঠাকুরবাড়ীতে আসতেন। রবীন্দ্রনাথের দাদাদের সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব, যদিও বয়সে তাঁদের সকলেরই চেয়ে অনেক বেশী। মাথায় মস্ত বড় এক টাক, গোঁফ দাড়ি নির্মূল ক'রে ছাঁটা, দাঁত একটিও নেই। স্নিগ্ধ শান্ত মুখ, রহস্যপ্রিয় ও সদানন্দময়। তিনি ফরাসী খুব ভালো জানতেন—ইংরেজী জানতেন না। তামাক খেতেন—অম্বুরী তামাক, পাশে থাকত দীর্ঘ নল বিশিষ্ট একটি গুড়গুড়ি। কোলে সর্বদাই থাকত একটি সেতার। সব সময়ে গুণ গুণ করে গান করেন। অতি ভালো মানুষ।

বালকদের তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। বালক-কবির তিনি একজন অত্যন্ত ধৈর্যশীল শ্রোতা। যে কবিতাই শোনেন তাই তাঁর অত্যন্ত ভালো লাগে এবং তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

শ্রীকণ্ঠ সিংহ বালকদের গানও শিখাতেন। তাঁর শেখাবার পদ্ধতি ছিল এত অদ্ভুত যে, কখন তিনি গান শেখাতেন তা' বুঝাই যেত না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'তিনি তো গান শোনাতেন না; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না।'

রবীন্দ্রনাথ দুইটি ঈশ্বরস্তব রচনা ক'রে শ্রীকণ্ঠ সিংহকে পড়ে শোনান। স্তব দুইটি শ্রীকণ্ঠ সিংহের এতই ভালো লাগল যে, তিনি কবিতা দুইটি দেবেন্দ্রনাথকে দেন। সেই স্তব দুইটিতে সংসারের দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে প্রচুর বর্ণনা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ কবিতা দুইটি পড়লেন, এবং "সংসারের দুঃসহ দাবদাহ এত সকাল সকালই যে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে পীড়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে, পয়ারছন্দে তাহার পরিচয় পাইয়া তিনি খুব হাসিয়াছিলেন।"

বাড়ীতে তখন সাহিত্যের চর্চা প্রবল বেগে চলছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ তাঁদের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলে এক নাট্যকলা পরিষদ গঠন করেছেন এবং রামনারায়ণ তর্করত্নকে দিয়ে 'নব নাটক' নামে একটি নাটক রচনা করিয়ে ঠাকুর বাড়ীতে অভিনয় করলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ছয় বৎসর। একটু বড় হয়ে দেখতে পাচ্ছেন দাদারা সবাই সাহিত্য এবং সংগীত চর্চায় নিমগ্ন। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ 'স্বপ্নপ্রয়ান' কাব্য রচনায় মগ্ন আছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

"বড় দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর তাঁহার ঘন ঘন উচ্চহাস্যে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসন্তে আমে বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে, তেমনি 'স্বপ্নপ্রয়ানে'র কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই।' [জীবনস্মৃতি

রবীন্দ্রনাথ বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতেন—এই ভাবে শুনে শুনে অনেক স্থান তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথও কাব্যরচনা আরম্ভ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে সংগীতচর্চা। বিষ্ণু চক্রবর্তী আর শ্রীকণ্ঠ সিংহের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। আর এলেন যদুভট্ট। যদুভট্ট বা যদুনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর সংগীতজ্ঞ এবং বিখ্যাত ধ্রুপদীয়া। বাড়ীতে সব সময় গান বাজনা, কাব্যচর্চা চলেছে,—বাড়ীতে

একটা সাহিত্যের হাওয়া সব সময়েই বইছে। এর মধ্যে বড় হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ—সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের খুবই অনুকূল অবস্থায়।

ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্যের আসরে বাইরে থেকেও অনেক গুণীর সমাগম হত। আসতেন রাজনারায়ণ বসু ও রামনারায়ণ তর্করত্ন। আসতেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। আসতেন কবি ও ইংরেজী সাহিত্যজ্ঞ অক্ষয় চৌধুরী। নাট্যাভিনয়ে কখনও কখনও আসতেন বঙ্কিমচন্দ্র ও গুরুদাস। কেশব সেনও কিছুদিন ঠাকুর বাড়ীতে ছিলেন। ছিল 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' নামে এক সভা। তার উপরে সাহিত্যরসিক দাদারা, রবীন্দ্রনাথের কাব্যচর্চার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। ফলে তাঁর সেই নীল খাতা কবিতায় ভর্তি হয়ে গেল।

হিমালয় যাবার পথে শান্তিনিকেতনে 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে এক কাব্য রচনা করেন এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। হিমালয় হতে ফিরে আসার পর অনেক কবিতা লিখে ফেলেন। কয়েকটি কবিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়। এ-কবিতাগুলোর রচয়িতার কোনও নামোল্লেখ ছিল না। একটি কবিতা 'অভিলাষ' ছাপা হয় 'দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের রচনা' রূপে। আর একটি কবিতা 'প্রকৃতির খেদ' ছাপা হয় 'বালকের রচিত' বলিয়া। দ্বিতীয় কবিতাটি 'বিদ্বজ্জন-সমাগম সভায়' পাঠ করাও হয়েছিল। প্রভাতকুমার বলেন, 'ঐ সভায় রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ প্রায় একশত গ্রন্থকার ও বিদ্বান্ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।' 'অভিলাষ' ও 'প্রকৃতির খেদ' কবিতার প্রথম কয়েক পংক্তি নিচে দেওয়া হইল ঃ

অভিলাষ

জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার।

অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

প্রকৃতির খেদ

বিস্তারিয়া ঊর্মিমালা
বিধির মানস-বালা
মানস-সরসী ওই নাচিছে হরষে
প্রদীপ্ত তুষার রাশি,
শুভ্র বিভা পরকাশি,
ঘুমাইছে স্তব্ধভাবে হিমাদ্রী উরষে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তখন 'সরোজিনী' নামে একটি নাটক রচনায় ব্যাপৃত রয়েছেন। বালক রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবক্রমে একটি গদ্য বক্তৃতার স্থলে কবিতা বসিয়ে দেওয়া স্থির হল। কবিতাটি বালক-কবি অল্প সময়ের মধ্যেই রচনা করে' এনে সবাইকে বিস্মিত করে দিলেন। কবিতাটি হল

জ্বল্ জ্বল্ চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ—
পরাণ স'পিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।

রবীন্দ্রনাথের নামসহ যে-কবিতা প্রথম ছাপা হয় তার নাম 'হিন্দুমেলার উপহার'। কবিতাটি হিন্দুমেলায় পড়া হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন তেরো বৎসর আটমাস। কবিতাটি ছাপা হয় 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য়।

এই 'হিন্দুমেলা' স্থাপন সম্বন্ধে প্রভাতকুমার তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে লিখেছেন,

"রাজনারায়ণ বসুকে বাংলা দেশের নূতন স্বাদেশিকতার গুরু বলিলে বোধহয় শব্দের অপপ্রয়োগ হইবে না। ১৮৬১ অব্দে তিনি মেদিনীপুর হইতে 'শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভা স্থাপনের এক প্রস্তাব' শীর্ষক একটি ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশ করেন। কয়েকবৎসর পরে (১৮৬৫) কলিকাতায় আসিয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথ, গনেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও নবগোপাল মিত্রের সহিত যুক্ত হইয়া 'স্বাদেশিকদের সভা' স্থাপন করেন। প্রধানত ঠাকুর বাড়ীর দেবেন্দ্রনাথ ও গনেন্দ্রনাথের আর্থিক ও আন্তরিক সাহায্যে ও রাজনারায়ণের প্রেরণায় ও নবগোপালের প্রচেষ্টায় হিন্দুমেলা স্থাপিত হয়। ইহার প্রথম অধিবেশন ১২৭৩ সালের চৈত্রসংক্রান্তির দিন (এপ্রিল ১২, ১৮৬৭)। মেলার সম্পাদক গনেন্দ্রনাথ ও সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র।"

'হিন্দুমেলার উপহার' কবিতার প্রথম কয়েক পংক্তি পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল :

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসন 'পরি
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।
স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়েনাকো পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল,
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

এই বৎসরের হিন্দুমেলার অধিবেশন হয় কলকাতার পার্শিবাগান অঞ্চলে। সভাপতি হন রাজনারায়ণ বসু এবং সভার দ্বারোদ্ঘাটন করেন শোভাবাজারের রাজা কমলকৃষ্ণ দেব।

এই সময়ে দুটি জাতীয়ভাবোদ্দীপক গানও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন—এ দুটিও নামোল্লেখ ছাড়া ছাপা হয়। প্রথম গানটির প্রথম স্তবক এইরূপ :

ভারতরে তোর কলংকিত পরমাণুরাশি
যতদিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি
ততদিন তুই কাঁদরে।
এই হিমগিরি স্পর্শিয়া আকাশ
প্রাচীন হিন্দুর কীর্তি-ইতিহাস
যতদিন তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে
অশ্রুজলে তোর বক্ষ ভাসাইবে
ততদিন তুই কাঁদরে।

দ্বিতীয় গানটি বিখ্যাত এবং অনেকেরই জানা :

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মত
এককার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

॥ সতেরো ॥

কবির তেরো বৎসর পূর্বেকার লেখাগুলো নিজনামে ছাপা হয় নি। তেরো বৎসর আটমাস বয়সে প্রথম স্বনামে কবিতা প্রকাশিত হয়—'হিন্দুমেলার উপহার'। এর পর কিশোর কবির পরপর কয়েকটি কাব্য ও কবিতা প্রকাশিত হয়। এ-সব কবিতা ও কাব্যে বিহারীলাল চক্রবর্তী, দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ, দাদাদের বন্ধু অক্ষয় চৌধুরী এবং ইংরেজ কবি শেলী ও কীট্‌সের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়েরও ছায়া কোনও কোনও কবিতায় দেখা যায়।

তখন 'জ্ঞানাংকুর' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার হত। এই কাগজে কিশোর কবির কবিতা ও কাব্য প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অংকুরোদ্গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করিতে শুরু করিয়াছিলেন।'

'জ্ঞানাংকুরে' তাঁর প্রথম কাব্য 'বনফুল' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চৌদ্দ বৎসরেরও কিছু কম। 'বনফুলে' একটি কাহিনীকে কাব্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। অনেকটা অক্ষয় চৌধুরীর 'উদাসিনী' কাব্যের রচনারীতিতে লেখা।

এই সময়ে কতকগুলি ছোট কবিতাও তিনি লেখেন। 'বনফুল' কাব্য সম্বন্ধে প্রভাতকুমার বলেন,

'বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীকে রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা-কবিতার অন্যতম প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। কাহারও কাহারও মতে অক্ষয়চন্দ্রের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী

প্রভৃতি গাথা-কবিতা বা আখ্যায়িকা-কাব্য রচনা করেন।' তা' ছাড়া ভাব, ভাষায় দ্বিজেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল ও মধুসূদনের প্রভাবও দেখা যায়। 'বনফুল' আট সর্গে বিভক্ত—ছন্দ মিত্রাক্ষর। প্রথম কয়েক পংক্তি নীচে দেওয়া হল।

নিশার আঁধাররাশি করিয়া নিরাস
রজত সুষমাময় প্রদীপ্ত তুষারচয়
হিমাদ্রি শিখরদেশে পাইছে প্রকাশ
অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান ;
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গ উঠে
দিগন্তসীমায় গিয়া যেন অবসান।

তেরো বৎসর বয়সে এক বিরাট 'গাথা-কাব্য' লেখা বিস্ময়ের বিষয় ঘটে।

দ্বিতীয় কাব্য 'কবিকাহিনী' এর দুই বৎসর পরে লেখা, যদিও পুস্তকাকারে ছাপা হয় প্রথম। 'কবিকাহিনী' চার সর্গে রচিত এবং 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়। এই 'ভারতী' মাসিক পত্র ঠাকুর বাড়ী থেকে প্রকাশিত হয় ১৮৭৭ সালের জুলাই মাসে—সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ। 'কবিকাহিনী' রচনা কালে রবীন্দ্রনাথের বয়স প্রায় ষোল।

ষোল বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যাপতির অনুকরণে ব্রজবুলিতে পদাবলীও লেখেন—নাম দেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। এই 'ভানুসিংহের পদাবলী' সম্বন্ধে কৌতুকজনক আখ্যান আছে। তিনি এই পদাবলীগুলো রচনা করে তাঁর এক বন্ধুকে শুনিয়ে বলেন যে ব্রাহ্মসমাজের লাইব্রেরীতে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন পুঁথি থেকে তিনি এগুলো কপি করে' এনেছেন। বন্ধুটি কবিতাগুলির খুবই প্রশংসা করেন, কিন্তু যখন তিনি গোপন রহস্য ফাঁস করে দিয়ে বলেন যে,

কবিতাগুলো তাঁর নিজেরই লেখা, তখন বন্ধুটি উত্তর দেন যে, নিতান্ত মন্দ হয় নি। তখন নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জার্মানীতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় গীতিকাব্য ও ভারতের গীতিকাব্য—দুইয়ের এক তুলনামূলক আলোচনা করে একখানি পুস্তক লেখেন। ঐ পুস্তকে তিনি ভানুসিংহ ঠাকুরকে বিদ্যাপতি প্রমুখ প্রাচীন পদকর্তাদের শ্রেণীভুক্ত করেন। ঐ গ্রন্থখানি লিখে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'ডক্টর', উপাধি লাভ করেন। 'ভানুসিংহ ঠাকুর' যে রবীন্দ্রনাথ একথা তাঁর জানা ছিল না।

এরপর ব্যারিস্টার হবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বিলাত যান। বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দুটি কাব্য রচনা করেন—'রুদ্রচণ্ড' ও 'ভগ্নহৃদয়'। তা' ছাড়া একটি কাব্যনাট্যও রচনা করেন—নাম 'বাল্মীকিপ্রতিভা'।

বিলাত যাবার পূর্বে তিনি অনেক কবিতাও রচনা করেন। তার মধ্যেকার কয়েকটি কবিতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তেরো থেকে আঠারো বৎসর বয়সে লেখা কবিতাগুলো 'শৈশব সংগীত' আখ্যা দিয়ে এক সঙ্গে গেঁথে ছাপানো হয়েছে। কবিতাগুলো প্রায় সবই 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল।

ববীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশব ও কৈশোরের রচনাকে অত্যন্ত তুচ্ছ ও মূল্যহীন বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাহলেও শৈশব ও কৈশোরের অপরিণত রচনায় ভবিষ্যতের অসামান্য কবি-প্রতিভার চিহ্ন সহজেই দেখতে পাওয়া যায়।

॥ আঠারো ॥

কবিতা ও কাব্যরচনার সাথে সাথে গদ্য লেখাও আরম্ভ হয়েছে। সেগুলো প্রায়ই সমালোচনা সাহিত্য বা বিভিন্ন বিষয়ে কবির মনোভাব-বিষয়ক প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার গদ্যরচনায় অপরিণত হাতের ছাপ প্রায় নেই বললেই হয়। গদ্যরচনায় যে-বিশ্লেষণী শক্তি ও ভাষার গাঁথুনী দেখতে পাওয়া যায় তা' বিস্ময়েরই সৃষ্টি করে। প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'জ্ঞানাংকুরে'—নাম 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসংগিনী'—তিনটি কবিতাগ্রন্থের সমালোচনা। প্রথম গদ্য রচনার একটু নমুনা দেওয়া গেল :

'মহাকাব্য আমরা পরের জন্য রচনা করি এবং গীতিকাব্য আমরা নিজের জন্য রচনা করি। যখন প্রেম, করুণা, ভক্তি প্রভৃতি বৃত্তি সকল হৃদয়ের গূঢ় উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন আমরা হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া তাহা গীতিকাব্যরূপ স্রোতে ঢালিয়া দিই এবং আমাদের হৃদয়ের পবিত্র প্রস্রবনজাত সেই স্রোত হয়তো শত শত মনোভূমি উর্বর করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল বর্তমান থাকিবে। ইহা মরুভূমির দগ্ধ বালুকাও আর্দ্র করিতে পারে। ইহা শৈলক্ষেত্রের শিলারাশিও উর্বরা করিতে পারে।'

ইহার পরে 'জ্ঞানাংকুরে' ও 'ভারতী'তে বহু প্রবন্ধ ছাপা হয়। বিলাতে থাকাকালীন, 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের বিলাত-প্রবাসের অভিজ্ঞতার একটি সরস বর্ণনা প্রদান করে।

অনেক সময় অত্যন্ত বিস্মিত হতে হয় যখন দেখা যায় যে, তিনি এত অল্প বয়সেই তখনকার দিনের বিখ্যাত প্রবন্ধলেখকদের মত

সুন্দর, সরস ও উন্নত চিন্তাশক্তির প্রকাশক প্রবন্ধ লিখবার শক্তির অধিকারী হয়েছেন।

তিনি এ-সময়ে একটি উপন্যাসও লিখতে আরম্ভ করেন—নাম 'করুণা', ভারতীতে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ শেষ করেন নি। একটি গল্পও লিখেছিলেন ঐ বয়সে--নাম 'ভিখারিণী'।

॥ উনিশ ॥

স্বাদেশিকতার দিক থেকেও ঠাকুরবাড়ী পশ্চাৎপদ ছিল না। 'হিন্দুমেলা'র কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যখন কিশোর বয়স তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশময় জাতীয়-ভাবোদ্দীপক বক্তৃতা করেছেন। জাতীয় আন্দোলনের ঢেউ ঠাকুর বাড়ীতে এসেও লাগে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সকল বিষয়েই প্রবল উৎসাহ, তার উপরে প্রেরণা পাচ্ছেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের কাছ থেকে। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন স্বাদেশিকতামূলক আন্দোলনের পুরোহিত। রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র হচ্ছেন অরবিন্দ ও বারীন্দ্র। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ যুবকগণ রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে স্বাদেশিকতার ভাবে উদ্দীপনা যোগায় এমনি একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করেন—নাম 'সঞ্জীবনী সভা'। সভার কার্যবিবরণী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লেখা হত। এই গুপ্ত ভাষায় 'সঞ্জীবনী সভা'কে বলা হত 'হামচূপামুহাফ'। রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়স্ক হলেও এই সভার একজন সভ্য ছিলেন। তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে এ সম্পর্কে বলেছেন,

'আমার মত অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায়

আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা, ভয়, সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না।'

ভারতবর্ষের সর্বজনীন পোষাক কিছু হতে পারে কি না সে-বিষয়েও সভ্যেরা চিন্তা করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পোষাকের নানা রকম নমুনা উপস্থিত করতেন। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

'ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লান বদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়ীতে গিয়া উঠিতেন—আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীর পুরুষ অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ী করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।' জীবনস্মৃতি]

এই সভার মাধ্যমে দেশলাই ও কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা এবং দেশী দেশলাই ও বস্ত্র প্রচার করারও প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু সভ্যেরা প্রায় সকলেই বাস্তবতাজ্ঞান বর্জিত ছিলেন বলে দেশলাইয়ের কল থেকে

কয়েক বাক্স দেশলাই এবং কাপড়ের কল থেকে সামান্য এক টুকরো গামছা ছাড়া আর কিছুই তৈরি করা যায় নি। মেট্রপলিটান স্কুলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ব্রজবাবুও একজন সভ্য ছিলেন। ঐ গামছার টুকরো পেয়েই তাঁর কী আনন্দ! তিনি সেই গামছার টুকরোটি মাথায় বেঁধে দুহাত তুলে নাচতে লাগলেন। স্বাদেশিকতার জোয়ার যখন প্রথম আসে, তখন এমনি উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল।

এই 'সঞ্জীবনী সভার' উত্তেজনাময় প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ দিল্লীর দরবার সম্বন্ধে এক কবিতা রচনা করেন—পড়া হয় 'হিন্দুমেলায়'। এই 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠা ও কার্যাবলী সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই সভায় কবি নবীনচন্দ্র সেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ কবিতা শুনে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। 'সাধারণী' পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিবরণী প্রকাশিত হয়:

'রবীন্দ্রবাবু দিল্লী-দরবার সম্পর্কে একটি কবিতা এবং একটি গীত রচনা করিয়াছিলেন। আমরা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষছায়ায় দুর্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার কবিতা এবং গীতটি শ্রবণ করি। রবীন্দ্র এখনও বালক, তাঁহার বয়স ষোল কি সতর বৎসরের অধিক হয় নাই। তথাপি তাঁহার কবিত্বে আমরা বিস্মিত এবং আর্দ্রিত হইয়াছিলাম। তাঁহার সুকুমার কণ্ঠের আবৃত্তির মাধুর্যে আমরা বিমোহিত হইয়াছিলাম।'

॥ কুড়ি ॥

রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার শক্তিও ছিল অসামান্য। অত্যন্ত মিষ্ট স্বর—অতি শৈশব থেকেই বাড়ীর সংগীতের আবহাওয়ার মধ্যে থেকে সুর সম্বন্ধেও প্রচুর জ্ঞান লাভ করেছেন। কিশোরী চাটুয্যের কাছে শুনেছেন পাঁচালী গান, আর শ্রীকণ্ঠ সিংহের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত। শ্রীকণ্ঠ সিংহের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তিনি সব সময় গুণ গুণ করে সুর ভাঁজতেন, আর কিশোর-কবির কাণে পৌঁছে তাঁকেও সুর শিক্ষার পথে এগিয়ে দিতেন। রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা'য় বলেছেন :

"আমাদের বাড়ীর শ্রীকণ্ঠ বাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন। বারান্দায় বসে বসে চামেলির তেল মেখে স্নান করতেন; হাতে থাকত গুড়গুড়ি, অম্বুরি তামাকের গন্ধ উঠত আকাশে; গুণ গুণ গান চলত, ছেলেদের টেনে রাখতেন চারদিকে। তিনি তো গান শেখাতেন না; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল জ্বল করত, গান ধরতেন—'ময় ছোঁড়ো ব্রজকী বাসরী'। সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না"।

রবীন্দ্রনাথকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গান শেখাবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষাভ্যাসের মতই এখানেও তাঁর মন গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে শিক্ষালাভ করতে প্রস্তুত নয়। ফলে কিছুটা সংগীত শিক্ষকদের কাছ থেকে আর বেশীটা নিজের প্রতিভাবলেই তিনি সংগীতে পারদর্শিতা লাভ করেন।

আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তীকে নিযুক্ত করা হয় কিশোর রবীন্দ্রনাথকে গান শেখাবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ কিছুটা আনমনা ভাবেই 'ব্রহ্মসংগীত' শিখেছিলেন তাঁর কাছে। বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে যা' শিক্ষালাভ করেন তার চেয়ে বেশী শেখেন বাড়ীর চারপাশের গানের আবহাওয়া থেকে। ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা সভায় উপস্থিত থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুরে বাঁধা ব্রহ্মসংগীত শুনছেন—বাড়ীতে আত্মীয়েরা এবং দাদারা তানপুরা সহযোগে প্রাচীন সংগীতের সুরের সাথে অন্যান্য সুরের মিশ্রণ করে নানা রকম পরীক্ষা করছেন তাও তাঁর কানে এসে পৌঁছাচ্ছে। জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক মনের মধ্যে সুরের ফুলঝুরি খেলে যাচ্ছে। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ যদুভট্ট বা যদুনাথ ভট্টাচার্য যখন ঠাকুরবাড়ীতে সংগীত শিক্ষক নিযুক্ত হন, তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু বেশীর ভাগ গানই তাঁর শেখা হয় আপন মনে। তিনি 'ছেলেবেলা'তে লিখছেন,

'ইচ্ছে মত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভর্তি করেছি তাই দিয়েই। মন দিয়ে শেখা যদি আমার ধাতে থাকত, তাহলে এখনকার দিনের ওস্তাদরা আমাকে তাচ্ছিল্য করতে পারত না।'

প্রভাতকুমার তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'তে এ-সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,

'কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যাহা পাইয়াছিলেন তাহা হইতেছে দেশী গান, নানা লোকের মুখ হইতে শোনা—দাসদাসী কর্মচারী ভিখারী-বাউল মাঝি-মাল্লার গান। এইসব বিচিত্র সুরতরঙ্গ বালককে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিত। এই সব গানের ভাষা ও ভাব স্পর্শচেতন ভাবপ্রবণ বালকের চিত্তাকাশে যে সপ্তবর্ণের হোলিখেলা খেলিত, উত্তরকালে সুর-সৃষ্টিতে সে-সব কিভাবে কাজে লাগিয়াছিল, তাহা বিশ্লেষণ করা কঠিন, কিন্তু ইহাদের প্রভাব সুনিশ্চিত।'

কিশোর রবীন্দ্রনাথকে সংগীতসাধনার পথে এগিয়ে দিতে দাদা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও অনেক সহায়তা করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো কিনে এনে ছাদের ঘরে বসালেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানো বাজিয়ে সুর তোলেন, আর রবীন্দ্রনাথ তার সাথে গেয়ে যান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানের পদ্ধতি ছিল অভিনব। সাধারণতঃ প্রথমে গান ভাষায় রচনা ক'রে পরে তাতে সুর দিয়ে গাওয়া হয়, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রণালী ছিল উল্টো রকমের। প্রথমে পিয়ানো বাজিয়ে তিনি সুর সৃষ্টি করতেন, আর রবীন্দ্রনাথের কাজ ছিল সেই সুরের মধ্যে মুখে মুখে গান রচনা করে বসিয়ে দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা'য় বলছেন,

'জ্যোতিদাদা পিয়ানোর উপর হাত চালিয়ে নতুন নতুন ভঙ্গীতে ঝমাঝম্ সুর তৈরি করে যেতেন; আমাকে রাখতেন পাশে। তখনই তখনই সে ছুটে-চলা সুরে কথা বসিয়ে বেঁধে রাখবার কাজ ছিল আমার।'

॥ একুশ ॥

রবীন্দ্রনাথকে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে, গৃহে শিক্ষা দেবার যা' আয়োজন করা হয়েছে, তাতে বিশেষ কোনও ফল লাভ হচ্ছে না। মাতা সারদা দেবীও মারা গেছেন। মাতৃহীন রবীন্দ্রনাথের উপর সকলেরই করুণা ও স্নেহ। অভিভাবকেরা চিন্তিত হলেন বালকের কী করা যায়। দাদা এবং বৌদিদিদের মনে খুবই কষ্ট যে, রবির কিছুই হল না। সেই সময় সেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন রবীন্দ্রনাথকে বিলাতে পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করিয়ে আনতে। সকলেই সম্মতি দিলেন—সত্যেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করলেন। কিছুদিন আমেদাবাদে নিজের কাছে এবং পরে বোম্বাইয়ে কিছুদিন রেখে চালচলন আদবকায়দা শিখিয়ে এবং ইংরেজী বলার কিছুটা অভ্যাস করিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২০ সেপ্টেম্বর বিলাত রওনা হলেন।

প্রভাতকুমার তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনকথা'তে বলছেন, 'রবীন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়েছিলেন লাজুক নম্র বালক, ফিরলেন প্রগল্‌ভ যুবক।'

আমরাও লাজুক, নম্র কিশোর রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা এখানেই শেষ করলাম।

'বাল্য দিয়ে যে-জীবনের
আরম্ভ হয় দিন
বাল্যে আবার হোক না তাহা সারা।
জলে স্থলে সংগ আবার
পাক না বাঁধনহীন,
ধূলায় ফিরে আসুক না পথহারা।'

['শিশুর জীবন'—শিশু ভোলানাথ]

